সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ়
১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৬

নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ অব্দের ২১ জুলাই) কলিকাতায় ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমুখ জাতীয়-সাহিত্য-অনুরাগী কতিপয় সভ্য 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' নামে আপত্তি করায় এবং "বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক" ও "অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা হয়" মনে করায় ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে অভিহিত হয়।

১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট) মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঁচজন ন্যাসরক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করিয়া পরিষদ্‌মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন। বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ধনী-দরিদ্রের দানে পরিষদ্‌মন্দির নির্মিত হয় এবং ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহপ্রবেশ-উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে সাহিত্য-পরিষদের "অভ্যুদয়কে বাঙ্গলাদেশের পুণ্যফল" বলিয়া গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

"ইহা ভোজবাজির খেলার মত অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে একরাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃৎসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

বাঙালী ইহাকে পোষণ করিবে, রক্ষা করিবে, ইহার অভাব দূর করিয়া নিজের অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি।

তবুও মন হইতে ভয় দূর হয় না। কারণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহারা স্বভাব হইতেই ভ্রষ্ট হয়। ভাগ্যে যাহার দুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাস্পদকেও অন্নদান করিতে বিমুখ হয়।

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,—এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত অমঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে—তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক একটি বড় বড় বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে। বাঙলাদেশের ক্রোড়ে যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষৎ-রূপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক—বিধাতাপুরুষ এই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া

তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্যলিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীর্ত্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিতেছি।"

বাঙলার মহাপুরুষদের স্পর্শপূত এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাভাবে সংস্কার করা হয় নাই। দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্র চিত্র সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানের ও উপকরণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সহায়তার দ্বারাই এ কার্য সম্ভব হইতে পারে। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কার্যে সহায়তার জন্য বাঙলার ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্যে ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ্-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ সংস্কারের কার্যে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে শ্রমদান করেন।

পরিষদভবন ও রমেশভবনের ভিতরের সমস্ত কক্ষ এবং বাহিরের সমস্ত অংশ সংস্কার করিয়া চুনকাম ও রং করিয়া দিবার ভার ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহসংস্কারের উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বহন করিবার জন্য পরিষদের সুহৃদ ও সভ্যগণ স্বেচ্ছায় কিছু কিছু অর্থদান করিয়াছেন, সেই সাহায্য হইতে পরিষদমন্দিরের সংস্কার কার্য করা হইতেছে। সমগ্র পরিষদমন্দিরের সংস্কার, জীর্ণ ও বিবর্ণ চিত্রগুলির নবরূপায়ণ, দুই লক্ষাধিক গ্রন্থ ও পত্রিকা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য বহু উপকরণ সামগ্রী আসবাব এবং অর্থ প্রয়োজন। সভাকক্ষ ও পাঠকক্ষের জন্য বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার প্রয়োজন, দুর্লভ পুস্তক রাখার জন্য স্টিল র‍্যাক ও আলমারি প্রয়োজন।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহকসমিতির পক্ষ হইতে আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা সাধ্যমত উপকরণ সামগ্রী শ্রম ও অর্থদান করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কারকার্যে সহায়তা করুন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর জাতীয় সম্পত্তি, পূর্বপুরুষগণের এই রিকৃথ রক্ষা করিবার দায়িত্ব বাঙালীমাত্রেরই। বাঙালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ দানে ইহা প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে, বাঙালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ দানেই ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

পরিষদ্-মন্দির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সকল সামগ্রী উপকরণ শ্রম ও অর্থ শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩৮০।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীমদনমোহন কুমার
সভাপতি	সহকারী সভাপতি	সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বর্ষ ৮০ । প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ—আষাঢ়

১৩৮০

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বর্ষ ৮০ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—আশ্বিন

১৩৮০

সূচীপত্র

ক্রোড়পত্র

মূল্য : প্রতিসংখ্যা—২·০০ টাকা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই কার্য সম্পূর্ণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া এই অভিধান সঙ্কলনের তত্ত্বাবধানের ভার জাতীয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের উপর দিয়াছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে অভিধান সঙ্কলনের কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

এই কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য বহু সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ, বৃত্তিভোগী ও অবৈতনিক, গবেষক ও কর্মীর প্রয়োজন হইবে। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী কয়েকজন ব্যক্তির অনুগ্রহে অভিধান প্রস্তুতের জন্য চারিজন বৃত্তিভোগী গবেষককে অভিধান সঙ্কলনের কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অনুরাগী বহু ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে সহায়তা ও স্বেচ্ছাশ্রমদানের প্রস্তাব করিয়া পরিষদে পত্রপ্রেরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ও বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তি সহায়তা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলের সাহায্য সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

পরিষদ্ অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অর্থ সংগৃহীত হইলে বৃত্তির সংখ্যা বাড়ান হইবে। অভিধান প্রস্তুতের ও প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে।

অভিধান সঙ্কলনের কার্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ৬ হাজার প্রাচীন পুঁথি এবং গত দুই শত বৎসরে বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদি হইতে শব্দসংগ্রহ ও প্রয়োগের নিদর্শন উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা হইবে। পোর্তুগীজ পাদ্রি মানোএল-দা-আসুম্পসাওঁর বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ (১৭৪৩) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন কোষগ্রন্থে ধৃত শব্দাবলীর সাহায্যও গ্রহণ করা হইবে। বঙ্গভাষাভাষী যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ ও প্রত্যন্ত প্রদেশের শব্দ ও প্রয়োগের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন সেগুলিও এই অভিধান-প্রণয়নের কার্যে ব্যবহার করা হইবে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙলা ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট শব্দ ও প্রয়োগের নিদর্শন সংগ্রহের ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর দেওয়া হইবে। বঙ্গভাষা-অনুরাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণের প্রস্তাব করিলে তাঁহাদের উপর যথা প্রয়োজন দায়িত্ব দেওয়া হইবে।

পরিষদের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত হইলেও অর্থাভাবে পরিষদের কোন মহৎ কার্য কখনও বন্ধ হয় নাই। পরিষদ্ বঙ্গভাষী জনগণের সমবেত চেষ্টা ও সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কার্যে সর্বসাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮০, সংখ্যা—১
বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৮০

ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(ঝাড়গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর, চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৭৯, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৩)

এবারকার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পশ্চিম-বাঙ্গলার পশ্চিম সীমানার প্রত্যন্ত অঞ্চল এই ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক গঠনে এবং ইহার সাম্প্রতিক পরিপোষণে এই অঞ্চলের লক্ষণীয় দান আছে। পশ্চিম-রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম-মেদিনী-পুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহভূম, পশ্চিম-বাঁকুড়ার সংলগ্ন বারভূম ও মানভূম, এবং উত্তর-রাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার-প্রদেশের সাঁওতাল-পরগণা ও হাজারী-বাগের পূর্ব অংশ—এই-সমস্ত অঞ্চল, রাঢ়খণ্ডেরই অধীন—ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ-বঙ্গেরই অংশ। বৃহৎ-বঙ্গের অংশ হইলেও, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার পশ্চিমেই বিহার-প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট-নাগপুর—চাঁইবাসা, কোল্‌হান্, রাঁচি, হাজারীবাগ ও পালামৌ জেলা, এবং মধ্য-প্রদেশের সরগুজা জেলা—এইগুলি লইয়া "ঝাড়খণ্ড" অঞ্চল—বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ়ভূমির এবং "সুহ্ম" বা "সুব্‌ভ" অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ভূমির "সামন্ত" বা সীমান্ত অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চল—সেখানকার মুখ্য আদিবাসীরা বাঙ্গালীর কাছে "সামন্ত-পাল," "সামন্তরাল" বা "সাওঁতাল" (অথবা "সাঁওতাল") নামে পরিচিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, অসুর, বীর-হড়, জুআঙ প্রভৃতি কোল-জাতীয় আদিবাসী, তথা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ এবং মালের্ বা মাল-পাহাড়ী আদিবাসী—ইহারাই এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী—এই ঝাড়খণ্ড ইহাদের নিজের দেশ। আর্য্য-ভাষী মগহিয়া, মৈথিল ভোজপুরী, বাঙ্গালী এবং ছত্তিসগঢ়ীদের চাপে পড়িয়া ইহারা এখন নিজেদের মাতৃভূমিতেই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, এই দেশের প্রতি তাহাদের জাতি-বা বংশ-গত দাবীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, তাহারা এখন ভারত-রাষ্ট্রের মধ্যে "ঝাড়খণ্ড" নামে একটি স্বতন্ত্র ও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে পরিচালিত নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছে—যদিও নানা দিক্ হইতে তাহার পথে অনপনেয় বাধা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, সে অন্য কথা।

কোল ও দ্রাবিড় (দ্রমিড়) জাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চল হইতে আগত রাঢ়-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট সাঁওতাল প্রভৃতি কোল-জাতির মানুষের প্রভাবে পড়িয়া, পশ্চিম-বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম বা পুরুলিয়া, এবং পশ্চিম-বর্ধমান ও পশ্চিম-মেদিনীপুর—ঝাড়গ্রাম ও

ধলভূম—ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, ভাষায় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের এক অখণ্ড অংশ হইয়াও, কতকগুলি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, একটা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালীর জীবনচর্য্যা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, কোল ও দ্রাবিড় জাতির এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিরাত জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু-কিছু উপাদান আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে আর্য্য-পূর্ব যুগের এই অনার্য্য-ভাষী দ্রমিড়, নিষাদ (বা কোল) এবং কিরাত (বা মোঙ্গোল) শ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে লব্ধ উপাদান যাহা পাওয়া যায়, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞগণ তাহার অল্প-স্বল্প অনুসন্ধান ও আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। বাঙ্গলা দেশে আর্য্য-ভাষী ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজের উদ্ভবের পূর্বে, সমগ্র বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে দ্রমিড়, নিষাদ ও কিরাত জাতির যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার পরে সাম্প্রতিক কালেও আবার এই-সমস্ত জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গলা-দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির, ভাষার, রীতি-নীতির মধ্যে যে অল্প-স্বল্প পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহা পশ্চিম-মেদিনীপুরের মত সাঁওতাল-অধ্যুষিত স্থানেও পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলের সাঁওতালগণ অবশ্য সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ নহে, কিন্তু সংখ্যায় নগণ্যও নহে। বিগত দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া স্থানীয় সাঁওতালগণকে আর "আদিবাসী" পর্য্যায়ের নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলিয়া অবহেলা করিতে পারা যায় না। গ্রামীণ জীবনে, আদিবাসী সাঁওতাল কৃষিজীবী এবং সাধারণ হিন্দু কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করিবার কিছু নাই ; উভয়েরই জীবনের মান এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা একই হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেবল সাঁওতালগণ অনেকটা বঙ্গভাষী হইয়া গেলেও নিজেদের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা এখনও ভুলে নাই—মাতৃভাষার চর্চা করিতে বিশেষ ব্যগ্র। কিছুটা বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রভাবে পড়িয়াও, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে বাহ্যতঃ অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেও, নিজেদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি সম্বন্ধে, ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এবং নাচ প্রভৃতি ব্যাপারে ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, সাঁওতাল জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে এখনও বিশেষভাবে সচেতন রহিয়াছে, সাঁওতালী সমাজ-জীবনকে সানন্দ আগ্রহের সহিত এখনও তাহারা ধরিয়া আছে। যে-সকল সাঁওতাল ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছে, ইউরোপীয় মিশনারিদের অনুগ্রহে তাহারা যে-সব সুবিধা সুযোগ পাইয়া শিক্ষায় ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, অ-খ্রীষ্টান সাঁওতালগণ সংহতি-শক্তির অভাবে এবং প্রবল শিক্ষিত জনের নেতৃত্বের অভাবে তাহা হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত। তথাপি সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্য্যাদায় এখন গৌরববোধের সহিত প্রতিষ্ঠিত এই-সকল সাঁওতাল—ইঁহাদের মধ্যে নামতঃ খ্রীষ্টানও অনেক আছেন—উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন, বৃত্তি-বিষয়ে সরকারের আনুকূল্য লাভ করিতেছেন, এবং সরকারী চাকুরীতে—বিশেষতঃ কতকগুলি পেশায় (যথা ফৌজী পুলিসে ও সেনাবাহিনীতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সহৃদয় সাঁওতাল, শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কায়েম

থাকিয়া সাঁওতালী ভাষার সাহিত্যিক পরিবর্ধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। এবং মুখ্যতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের দৃষ্টান্তে, গল্প কবিতা ও নিবন্ধাত্মক এক আধুনিক সাঁওতাল সাহিত্য সৃজন করিতেছেন। সাঁওতাল চিত্তের যে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাঁওতালী গীতিকবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—সাঁওতাল পরম্পরাগত সাঁওতাল জীবন-চর্য্যার যে-সব মনোহর চিত্র রবীন্দ্রনাথের মত দরদী কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন সাঁওতালী শৈলীর এক নবীন যুগোপযোগী প্রকাশ, নূতন ভাবে এই-সব সাঁওতালী কবিতায় দেখা যাইতেছে। এই অভিনব সাঁওতালী সাহিত্যের বিকাশ, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে—এবং প্রায় পাঁচ লাখ সাঁওতালী-ভাষী মানবের দ্বারা সৃষ্ট নূতন যুগের এই সাহিত্য বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠিতেছে, সেই সাহিত্যের অন্যতম সর্জনা-কেন্দ্র হইতেছে এই পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল।

বাঙ্গালা লিপিতে মুদ্রিত এই আধুনিক সাঁওতালী সাহিত্য, সমগ্রভাবে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলার, এবং বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের একটি স্বকীয় দান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ঝাড়খণ্ডে সাঁওতাল-পরগণা জেলার দুমকার নিকটে বেনাগড়িয়া গ্রামে স্কাণ্ডিনেভীয় লুথারান খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচার-কেন্দ্রের ছাপাখানা হইতে, স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি A. Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্‌রুড্‌, "হড়্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ড়াম্‌কো-রেআঃক্‌ কাথা" অর্থাৎ "হড় বা সাঁওতাল জাতির পূর্ব-পুরুষদের ইতিকথা" এই নামে একখানি অতি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ রোমান্‌ লিপিতে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। এই বই হইতেই আধুনিক কালে সাঁওতালদের জাতীয় সাহিত্যের পত্তন আরম্ভ হইল বলা যায়। 'কলেয়ান' বা কল্যাণ-গুরু নামে একজন প্রাচীন সাঁওতাল জ্ঞানবৃদ্ধকে ডাকিয়া মিশনারি সাহেব তাঁহার মুখ হইতে সাঁওতালী পুরাণ-কথা এবং সামাজিক রীতি-নীতির কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লয়েন। বহুদিন ধরিয়া এই বই ইংরেজীতে বা অন্য কোনও ভাষায় অনূদিত হয় নাই, কিন্তু সাঁওতাল ভাষা শিখিয়া লইয়া অনেকে এই বই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল-ভাষাবিৎ P. O. Bodding বডিং-এর করা ইংরেজী অনুবাদ Sten Konow স্তেন্‌ কনৌ সাহেবের সম্পাদনায় নরওয়ে-দেশের Oslo অস্‌লো নগরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পরে এই বই ভারত-সরকারের জনগণনার সচিব শ্রীঅশোক মিত্র আই-সী-এস্‌ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁস্‌দাঃক্‌ নামে একজন শিক্ষিত সাঁওতাল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভারতীয় সাহিত্যের এই মূল্যবান্‌ আকর-গ্রন্থ, কোল-জাতির ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বেদ ও পুরাণ একাধারে যাহাকে বলা যায়, তাহার প্রকাশের কৃতিত্ব উত্তর-ঝাড়খণ্ডের দুমকা অঞ্চলের কল্যাণ-গুরুর এবং নরওয়ে হইতে আগত পাদ্রি A. Skrefsrud সাহেবের। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের প্রায় সতেরো কিংবা আঠারো বৎসর পরে, ধলভূম ও পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, রামদাস টুডু মাঝি নামে এক জ্ঞানী সাঁওতাল পণ্ডিত, নিজের আগ্রহে, অনুরূপ আর একখানি পুস্তক সংগ্রহ ও রচনা করিয়া কলিকাতায়

ছাপাইয়া প্রকাশ করেন, অনুমানিক ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—"খেরবাল্‌বাংসা ধারাম-পুথি" (অর্থাৎ "খেরওয়াল বা সাঁওতাল বংশের বা জাতির ধর্ম-পুস্তক")। এই বইয়ের একখানি মাত্র মুদিত পুস্তক ঘাটশিলায় ১৯৪৬ সালে আমি শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মু ও শ্রীযুক্ত ডোমনচন্দ্র হাঁসদাক্‌ এই দুইজন সাঁওতাল ছাত্রের আনুকূল্যে দেখিতে পাই। ধলভূমের রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বাহাদুরের ম্যানেজার স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রায়-অপ্রাপ্য বইয়ের একটি নূতন সংস্করণ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটশিলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমি একটি ভূমিকা লিখিয়া দেই। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর অতি শোচনীয় আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর জন্য, ঐ বইয়ের প্রচার হয় নাই। অধুনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুহৃদ্‌ ভৌমিকের আগ্রহে ও চেষ্টায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ, ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে এই ঝাড়গ্রাম হইতেই। রামদাস টুডু ধলভূম-রাজ্যের প্রজা ছিলেন, কাড়ুয়াকাটা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার এই ধর্ম-পুস্তক নিজের আঁকা ছবিতে পূর্ণ, এবং নানা বিষয়ে এই বই কল্যাণ-গুরুর পুস্তক অপেক্ষা পূর্ণতর, যদিও ইহাতে হিন্দু ধর্ম ও পুরাণ-কথার প্রভাব আরও অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই নূতন সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইলে, আর্য্য-অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বিষয়ক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া রামদাস টুডু মাঝির এই অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব ঝাড়গ্রাম লাভ করিবে। রামদাস টুডুর দৃষ্টান্তে সাঁওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও রীতি এবং ধর্ম ও ধার্মিক অনুষ্ঠান লইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গভীর বিচার ও অনুভূতিশীল একজন বিশিষ্ট সাঁওতাল চিন্তানেতা, শ্রদ্ধেয় মিত্রবর শ্রীযুক্ত নায়েকে মঙ্গল চন্দ্র সরেন, ভূতপূর্ব এম-এল-এ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভা) সাঁওতাল ভাষায় কতকগুলি গান ও অন্য রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন—ইঁহার নিবাস-স্থান এই মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী শিলদা ডাকঘরের অধীন আতোঢুয়া পাহাড়ী গ্রাম হইতে (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। ইঁহার এই সাহিত্যিক কৃতি মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখন সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কতকগুলি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে—সাঁওতাল-পরগণায়, ধলভূমে, পশ্চিম-মেদিনীপুরে, হাওড়ায়, হুগলী জেলার খানাকুল ও রাধানগর অঞ্চলে, উত্তর-বঙ্গে এবং কলিকাতায়। সাঁওতালীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ ও অনুকরণ হইতেছে, ছোট গল্প ও নাটক বাহির হইতেছে, সাঁওতালী যাত্রা অভিনীত হইতেছে। ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম ভাষা-গোষ্ঠীর একটি সংখ্যা-বহুল ভাষা নূতন করিয়া সাহিত্যিক মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়া, সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন করিয়া চলিবার পথ ধরিয়াছে—এ বিষয়ে মেদিনীপুরের অনুদান লক্ষণীয়।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে ভাষণ দিতে আসিয়া, আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি লইয়া কিছু আলোচনা করিতে বসা, "ধান ভানিতে শিবের গীত" বলিয়া মনে হইতে পারে। এই অপ্রাসঙ্গিকতার একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়াছি—ভারতের সর্ব-ভাষাশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূলে ও বিকাশে উভয়েই এক, ইহাই প্রতিপাদনের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় কথা—বহুদিন ধরিয়া ভাগীরথী-তীরবর্তী মেদিনীপুরের পূর্ব অঞ্চল মাত্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এবং এক বাস্তু-বিদ্যা ভিন্ন অন্য শিল্পে, তেমন লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই। মেদিনীপুরের ভাগীরথী-তীর-সন্নিকটস্থ তমলুক নগর সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ব-ভারতে একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে পোতযোগে গমনাগমনের জন্য এই তমলুক বন্দর, যাহার প্রাচীন নাম ছিল "তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, দামলিপ্ত" প্রভৃতি, সমগ্র ভারতের পক্ষে অন্যতম প্রধান পূর্ব দ্বার স্বরূপ ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলী অঞ্চল, সাগরাশ্রিত দক্ষিণ-রাঢ়ের উপকূলে একটি প্রধান স্থান ছিল; এবং "কাঁথি" অর্থাৎ "কাঁথ" বা "কন্থা" অর্থাৎ Rampart বা "দুর্গপ্রকার" এই নামে যাহার পূর্বতন প্রাধান্য এখনও সূচিত হইতেছে, সেই দক্ষিণ হইতে রাঢ় ও গৌড়-বঙ্গদেশে প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত প্রধান দ্বারপথ এই নগর, কর্ণগড় ও মেদিনীপুর প্রভৃতির অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে একটি মুখ্য নগর ছিল বলিয়া অনুমান হয়। মধ্য-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের তুলনায় দক্ষিণ-রাঢ় বা মেদিনীপুর অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশেষ অরণ্য-সঙ্কুল ছিল বলিয়াই মনে হয়—"ঝাড়-খণ্ড" অর্থাৎ বৃক্ষ বা অরণ্যানী আবৃত দেশের, ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জের যেন এক পূর্বদিকের বিস্তার ছিল এই মেদিনীপুর। ওদিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রকোণা এবং এদিকে ঘাটাল মহিষাদল ও তমলুকের পথ ধরিয়া, এখনকার মেদিনীপুরের দক্ষিণে দাঁতন ও বালেশ্বর হইয়া, বালেশ্বর ভদ্রক ও কটকের পথে পুরী ও আরও দক্ষিণে যাওয়া, ইহাই ছিল মেদিনীপুর অঞ্চলের সঙ্গে বাহিরের জগতের মুখ্য সংযোগ-পথ। দেশ অরণ্যসঙ্কুল, দক্ষিণ হইতে উড়িয়া তেলুগু কানাড়ী ও তামিলজাতির মানুষের উত্তর-পূর্ব ভারতে গৌড়-বঙ্গে যাতায়াতের প্রধান পথ—যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই এই-সমস্ত দক্ষিণের মানুষের আগমন হইত। তবে তীর্থযাত্রা এবং অল্প-স্বল্প ব্যবসায় উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর দিয়া গৌড়-বঙ্গ এবং কাশী ও গয়া অঞ্চল হইতে ও ঝাড়খণ্ড হইতে লোকের যাতায়াত হইত, এবং বঙ্গভাষী জাতির মধ্যে বিলীয়মান আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি যাহারা আসিয়া এখানে বাস করিত, বেশীর ভাগ তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত অরণ্যসঙ্কুল ও বিপৎসঙ্কুল দেশ বলিয়া, ভাগীরথী-তীরের লোকেরা, মধ্য-ও উত্তর-রাঢ়ের শুদ্ধ বঙ্গভাষী লোকেরা, মধ্য-ও পশ্চিম-মেদিনীপুরে বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন, ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এখনকার মেদিনীপুর জেলা পুরাপুরী খাঁটী বাঙ্গলা-ভাষী জেলা নহে। জেলার সর্বত্রই অবশ্য শুদ্ধ সাধু ও চলিত বাঙ্গলা পঠিত লিখিত ও কথিত হইলেও, ভাগীরথী-তীরের শুদ্ধ চলিত ভাষা মাত্র জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত। তমলুকের পূর্বে, মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে, নারায়ণগড় ও সবং পর্যন্ত অঞ্চলে, যে বিশিষ্ট ধরণের বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত, তাহার নাম-করণ হইয়াছে South-Western Bengali 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা"। গৌড়-বঙ্গের ভাষা যে কয়টি মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে—যথা, রাঢ়ীয়, গৌড়ীয়, বারেন্দ্র, কামরূপীয়, কাছাড়-শ্রীহট্টীয়, পট্টিকেরীয় বা

কুমিল্লা-অঞ্চলীয়, বঙ্গদেশীয় বা বঙ্গাল, চট্টগ্রামীয় বা চট্টলীয়, এবং সমতটীয় বা দক্ষিণ-বঙ্গীয় —মেদিনীপুরের এই "দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা" এগুলির একটিরও মধ্যে আসে না। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডে, স্বল্প সংখ্যক জনের মধ্যে সীমায়িত বাঙ্গলার এই উপভাষাটির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এবং মনে হয় এই উপভাষা, স্বতন্ত্র ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে— একদিকে বাঙ্গলা-আসামী, অন্যদিকে উড়িয়া, এই দুইয়ের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে বলা যায় না। মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্র কথ্য ভাষার কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই। পূর্ব-ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলার এই উপভাষাকে "সুহ্ম" অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, **সুহ্ম-দেশীয়** অথবা **সুহ্মক বাঙ্গলা** এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। জিজ্ঞাস্য—এই "দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলা"র কেন্দ্র-স্থল "সবং" অঞ্চল—এই নামের মধ্যে কি "সুহ্ম" শব্দ লুকাইয়া আছে? "সুহ্ম = সুর্‌ভ; সুহ্মাঙ্গ = সুব্‌ভঙ্গ," পরে "সোবঙ্গ, সবং"?

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জর্জ এব্রাহাম গ্রিয়ার্‌সনের সঙ্কলিত Linguistic Survey of India-তে এই বিশিষ্ট বাঙ্গলা উপভাষার প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয়—মেদিনীপুর জেলার মধ্য-ভাগে, মেদিনীপুর থানার দক্ষিণে, ডেবরা থানার দক্ষিণে, সমগ্র সবং থানার উত্তরে, নারায়ণগড়ে, পশ্চিম পাঁশকুড়া থানায়, এবং পশ্চিম তমলুক ও পশ্চিম নন্দিগ্রাম থানায় —প্রধানতঃ কৈবর্ত বা মাহিষ্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই উপভাষা। ১৯০৩ সালের হিসাবে, জন-সংখ্যায় সাড়ে-তিন লাখ মাত্র লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই লোকভাষা, এখন হয়তো আরও কমিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সেক্রেটারি, বিদ্বান্, কবি ও গুণী কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য মহাশয় (স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন ইঁহার দৌহিত্র) এই উপজাতি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন (Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I, Specimens of the Bengali and Assamese Languagees, Calcutta 1903: পৃষ্ঠা ১১ এবং পৃষ্ঠা ৩৯ সংশ্লিষ্ট দুইখানি মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ভাষার একটি বিশেষ মূল্যবান্ নিদর্শন, মহীপাল মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলোকনাথ বসু কর্তৃক রচিত "গ্রাম্য উপন্যাস", "সোনার পাথর-বাটি" (নূতন সংস্করণ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)-তে পাওয়া যাইবে। বইখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এই প্রায়-অপ্রাপ্য বই একখানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। সুখের বিষয়, এই স্থানীয় বাঙ্গলার বইখানির মূল্য বুঝিয়া বইখানির প্রথম খণ্ডটি তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন, ও ইহার ভাষা-ভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৯৬৯ সাল, পৃঃ ১৩-৩৭)। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন। আমার Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, ১৯৭১ সালে পুনর্মুদ্রিত) এই "সুহ্মক" বাঙ্গলার বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা করিতে পারি নাই। মেদিনীপুর জেলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ বাঙ্গলাভাষার এই স্বতন্ত্র শাখার পূর্ণ আলোচনার অভাবে, বাঙ্গলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ

রহিয়া গিয়াছে। আশা করি যে বিজন-বাবু আরও বড় করিয়া মেদিনীপুরের এই উপভাষার আলোচনা করিবেন। ইহা ভিন্ন, জেলার অন্যত্র শুদ্ধ বাঙ্গলা অপেক্ষা শুদ্ধ বা মিশ্রিত উড়িয়া সমধিক প্রচলিত—বিশেষতঃ কাঁথি মহকুমায় ও উড়িষ্যার সংলগ্ন অন্য সর্বত্র। এবং পশ্চিম-মেদিনীপুরে 'মাহাতো' সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, ও সাঁওতাল-ভাষীও প্রচুর। উড়িয়া-ভাষী মেদিনীপুরীরা সকলেই বাঙ্গলা জানে, ইস্কুলে বাঙ্গলা পড়ে, নিজেদের বাঙ্গালী বলে, এবং ইহাঁদের সমাজ উড়িষ্যার অনুরূপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথক্। তথাপি উড়িয়ার প্রসার এত অধিক যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিমের লোকেরা সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসূদন জানা মহাশয়ের কাঁথি-নগরস্থ বিখ্যাত "নীহার প্রেস" হইতে, বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর উড়িয়া সাহিত্যগ্রন্থ, ধর্মবিষয়ক ছোট-খাট বই, এবং জগন্নাথ দাস রচিত সমগ্র ভাগবত-পুরাণ ও অন্য প্রধান গ্রন্থ মেদিনীপুরের লোকেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। এবং বাঙ্গালা অক্ষরে নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত এই-সমস্ত উড়িয়া গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল।

এই-সব কারণে, এক পূর্ব-মেদিনীপুর ভিন্ন অন্যত্র বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টির তেমন সুযোগ, মধ্য-প্রাচীন যুগে ছিল না। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার সাহিত্য-গৌরব ততটা লক্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর একটি ভাষার উন্নতি-বিধানেও মেদিনীপুরের হাত ছিল। হিন্দীর বিখ্যাত কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (উপনাম "নিরালা"—১৮৯৭-১৯৬১) আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে ১৯৩৫ সালের দিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন, যাহা হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে "ছায়াবাদ" নামে পরিচিত। মেদিনীপুরের মহিষাদল-রাজ্যের পশ্চিমা-ব্রাহ্মণ রাজবংশের ক্ষুদ্র সেনায়, উন্নাও জেলা হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা কর্মগ্রহণ করেন, এবং ঐখানেই কবির জন্ম হইয়াছিল। প্রায় সারা জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন, মেদিনীপুরেই খুব ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখেন, রবীন্দ্রনাথের ভাব-শিষ্য হইয়া তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, এবং আধুনিক হিন্দী কাব্যজগতে একটি অভিনব রবীন্দ্র-রীতি প্রবর্তন করেন, যাহার প্রভাব হিন্দী জগতে হইয়াছিল সুদূর-প্রসারী।

বাঙ্গলা ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ঘটিতেছিল খ্রীষ্টীয় ১০০০ এবং ইহার দুই-এক শতক পূর্ব হইতেই। ঐ সময়ে মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তনে উদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশ, আধুনিক ভোজপুরী মৈথিল মগহী, বাঙ্গলা আসামী এবং উড়িয়ার সাধারণ আদিম রূপ হিসাবে, কাশী মিথিলা মগধ, রাঢ় সুহ্ম, গৌড় সমতট বঙ্গ, বরেন্দ্র কামরূপ, শ্রীহট্ট পট্টিকেরা চট্টল, এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সংযোগ ভূমিতে ও উড়িষ্যায় প্রসৃত হয়। এই-সমগ্র প্রাচী অঞ্চল জুড়িয়া এক সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্র; তখন ভোজপুরী মৈথিল-মগহী বাঙ্গলা-আসামী-উড়িয়া তাহাদের পৃথক্ সত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক্ হইতে এই প্রাচী অঞ্চল, ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক বিশিষ্টতাময় গৌরবের স্থান অর্জন করে। মেদিনীপুর-অঞ্চল প্রাচীন তমলুক নগরকে আশ্রয় করিয়া এই গৌরবে

অংশ গ্রহণ করে, ইহার পরিবর্ধন করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য ভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে তমলুক অঞ্চল বৌদ্ধ তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে তাহা জানা যায়। তাহার পূর্বে, বৌদ্ধ পালি সাহিত্য ও গ্রীক ভৌগোলিকদের লেখা হইতে তমলুকের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথাও জানিতে পারি। তবে বাঙ্গলা উড়িয়া মৈথিল প্রভৃতি আধুনিক-আর্য্য-ভাষার পত্তনের বা স্থাপনার যুগে, যখন বাঙ্গলা ও উড়িয়ার মধ্যে পার্থক্য ততটা লক্ষণীয় ছিল না, তখন মেদিনীপুর-অঞ্চলের ভাষা যে, উভয় প্রকারের মাগধী অপভ্রংশ-জাত মিশ্র আর্য্য ভাষার ক্ষেত্র ছিল, তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায়। অরণ্যসঙ্কুল, প্রচুর পরিমাণে সাঁওতাল প্রভৃতি কোল আদিবাসীদের বাসভূমি বলিয়া, ঝাড়খণ্ডের মত এ অঞ্চলেও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। কখনও-কখনও মেদিনীপুর জেলা, বিশেষ ভাবে ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, উড়িষ্যার অংশ বলিয়া কেহ-কেহ উল্লেখ করিতেন; তবে স্থানীয় লোক এ সম্বন্ধে কখনও সচেতন বা সোচ্চার হন নাই, সহজেই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ভাগীরথী-তীরের দেশ ও বর্ধমান বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার প্রতি। এই গৌড়-বঙ্গের সাংস্কৃতিক হাওয়া সুদূর ঝাড়খণ্ডে, এবং মেদিনীপুরেও গিয়া পহুঁছিয়াছিল—গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃতির বিশিষ্টতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গেই। চৈতন্যদেবের প্রভাবে গৌড়-বঙ্গের যে সভ্যতা ও চিন্তাধারার, সাহিত্যের, ও সঙ্গীত এবং অন্য সুকুমার কলার উদ্ভব এবং প্রসার আরম্ভ হইল, তাহা মেদিনী-পুরের উচ্চ স্তরের এবং নিম্ন স্তরের জনগণ অক্লেশেই গ্রহণ করিলেন। মেদিনী-পুরের জীবন-চর্য্যা গৌড়-বঙ্গেরই অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গেল। "মেদিনীপুর" নামটি কবে সর্বজন-গৃহীত হইল, তাহা জানা যায় না। সংস্কৃত রূপ ধারণ করিলেও, বাঙ্গলা-দেশের ও ভারতের অন্য বহু ভৌগোলিক ও জাতিবাচক নামের মত, এই নামেরও পিছনে কোনও অজ্ঞাতমূল অনার্য্য কোল-জাতীয় নাম ঢাকা পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। সারা বঙ্গভাষী জনগণের মত মেদিনীপুরের লোকসাহিত্যে সেই একই জিনিস পাই—কৃষ্ণলীলার-গান, বৈষ্ণব নাম ও রসকীর্তন, হর-পার্বতীর গান, কালী-কীর্তন, এবং ঝুমুর গীত, টুসুর গান, ভাদুর গান প্রভৃতি নানা প্রকারের লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন হইতে মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও পহুঁছায়, এবং কোথাও-কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে) মেদিনীপুরের অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসিয়া বাস করেন, ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নরোত্তম দাস ও শ্রীনিবাসের সঙ্গ লাভ করেন, বৈষ্ণব-তত্ত্ব লইয়া কতকগুলি নিবন্ধ-কাব্য রচনা করেন, এবং গৌড়ীয় পদকর্তা মহাজনদের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন—বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাঁর উচ্চ স্থান স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুরের ভূমিতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ষোড়শ শতক হইতেই এইরূপে মেদিনীপুর বাঙ্গলার প্রবর্ধমান সাহিত্য-ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

মেদিনীপুরের বঙ্গসাহিত্য-অবদান-মালার মধ্যে আর দুই জন বড় সাহিত্যিকের নাম করিতে হয়—একজন, "শিবায়ন" বা "শিবমঙ্গল" কাব্যের এবং অন্য গ্রন্থের রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি ১৬৩২ শকাব্দে (১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে) "শিবায়ন" রচনা করেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। পরে ইনি মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটস্থ কর্ণগড়ে আসিয়া বাস করেন। আর একজন বড় বাঙ্গালী লেখক, প্রথম যুগের বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একজন প্রধান প্রবর্তক ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণের রচয়িতা (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ আনুমানিক), বাঙ্গলাসাহিত্য-রচনায় শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহযোগী ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, এবং কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ও লেখক, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইঁহার প্রধান রচনা হইতেছে "বত্রিশ সিংহাসন" (১৮০২), "রাজাবলী" (১৮০৮), "বেদান্ত-চন্দ্রিকা" (১৮১৭) এবং "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" (১৮৩৩)। ইঁহার জীবনকাল ঠিকমত জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহার সেবায় বঙ্গভারতী বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছেন, আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য ভাষার প্রতিষ্ঠায় ইঁনি ছিলেন সব্যসাচী।

মেদিনীপুরের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ অবদানের সঙ্গে আর একজন বিরাট্ পুরুষের নাম গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে—তাহা হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১)। ইঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ-গ্রাম জন্মকালে হুগলী জেলার অধীনস্থ ছিল, পরে ঐ গ্রামকে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইনি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের অধিবাসিগণেরও গর্বস্থল হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী কর্মোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরের অধিবাসীরূপে বাস করিয়াছিলেন, ও এইভাবে মেদিনীপুরও তাঁহাদের গৌরবের অংশ-ভাক্ হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অংশ-গ্রহণ এই সংগ্রামকে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। খুদিরাম বসু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশমাতার উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত পুণ্যশ্লোক আত্মত্যাগী বীরের আত্মবলিদানে মেদিনীপুর ও ভারতভূমি পবিত্র হইয়াছে, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহাদের স্মরণ করি, তাঁহাদের প্রণাম করি।

মেদিনীপুরের ভাগ্যবান্ জমীদার-কুলের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ-দাতা অনেকেই রহিয়াছেন। যেমন নাড়াজোল জমীদার বংশ। যেমন এই ঝাড়গ্রামের মল্লরাজ-বংশ—এই রাজবংশের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব—যিনি বঙ্গ-সাহিত্য প্রচারে নানা ভাবে সক্রিয় সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে প্রকাশ করাইবার জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন—পরিষদের সত্যকার হিতৈষী বান্ধব হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণের পক্ষে, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা যে, রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব এই ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী বলিয়া, চিল্কিগড়ে যাঁহাদের প্রাসাদ ও কেন্দ্র, সেই ধলভূম-মহারাজ ধবল-দেব বংশও পরিচিত।

উপস্থিত ছত্রিশতম বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা লাভ-লোক-সানের খতিয়ান, অন্ততঃ সংক্ষেপে পেশ করা, হয়তো সভাপতির অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেহ বা চাহিবেন, সাহিত্যের আদর্শ এবং বাঙ্গলার সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে "সারগর্ভ" আলোচনা। এই সমস্ত বিষয় এবং অনুরূপ বিষয় লইয়া কার্য্যকর বা উপযোগী আলোচনা করার পিছনে থাকা চাই—সাহিত্য-বিষয়ে লেখকের কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী উভয়বিধ প্রতিভা, সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বোধ ও সুবিবেচনা, এবং জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রীতি ও অনুরাগ-প্রসূত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। এই সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী না হইলে, সাহিত্য-বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সুদৃঢ় ভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, এইরূপ যোগ্যতার অধিকারী আমি নহি। রহস্য করিয়া আমি বলিয়া থাকি যে আমি সাহিত্যিক নহি, যাঁহারা সাহিত্যসৌধ রচনা করিয়া ভাষা-সরস্বতীকে মহীয়সী করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের অনুগামী একজন "মাটি-কাটা মজুর", সামান্য বাক্-তত্ত্বের আলোচক মাত্র। পরিতাপের সঙ্গে একথা স্বীকার করিব যে, আধুনিক সাহিত্যের অনেক কিছু আমার বোধগম্য নহে। শিল্পে আজ-কাল যেমন বাস্তবিকতার বিরোধী Modernism বা অতিআধুনিকতা এবং Abstract Art অর্থাৎ নিগূঢ়রূপ-প্রদর্শন অথবা "রূপ-সার" কল্পনা দেখা দিতেছে, অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা আমি ধরিতে ছুঁইতে বা বুঝিতে সমর্থ হই নাই, তেমনি সাহিত্যেও এই Ultra-modernism ও Abstractism কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। বিশেষতঃ কবিতা এবং কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই এখনকার বাঙ্গলা সাহিত্যে বড়-বড় কবি দেখা দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন-ও। কিন্তু "বয়োধর্ম্মেণ বুদ্ধি-ভ্রংশঃ"—সর্বক্ষেত্রে আমি তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে অপারক, এইরূপ নিগূঢ়-তত্ত্বের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যাঁহারা করিয়া থাকেন সেইরূপ প্রস্তাবকদের কাছে আমাকে তূষ্ণী অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হয়। "উটের মত হ'ল রজনী" ; "মানুষের আলজিভ কেটে দিয়ে অত্যন্ত আবেগে, প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে পুঁতে যাই আনন্দের গাছ" ; "সন্ধ্যা হ'লে অন্ধকারে চামচিকে, বাদুড়ের খেলা—দেখে দেখে এ অভ্যাস মজ্জাগত যাদের, তারাই—দুবেলা উকুন বাছে—কাছাকাছি আরশোলা ওড়ে" ; "শুয়োরের বাচ্চা হ'তে শখ হয়, তাইতো এখনো—সার্ডিন-মাছের তেলে মাছ-ভাজা এখন অরুচি" ;—প্রভৃতি ভাবগর্ভ ছত্রের অর্থ বা দ্যোতনা, ব্যর্থ আকুলতার সঙ্গে চিন্তা করি—এর চেয়ে আরও নিবিড় দেহ-ধর্ম-বিষয়ক, আরও ভাবগম্ভীর লাইনের অভাব নাই ;—সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বিচার বা আলোচনা বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হইবে।

বাঙ্গালীর আর সব কিছু গিয়াছে, বা যাইতেছে—কেবল অবশিষ্ট আছে তাহার

ভাষার সাহিত্যিক গৌরব। এই গৌরবকে জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টার বিরাম নাই। এবং আমাদের এই চরম দুর্দিনেও একটা আত্মপ্রসাদের কথা—কাঁটা-বনের মধ্যে একটি মিষ্টি ফলের মত—এই যে, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যে—গল্পে উপন্যাসে উপাখ্যানে নিবন্ধে রস-রচনায়—বাঙ্গালীর তাহার আত্মিক সত্তাকে এখনও একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্র শরতের অনুগামীদের পক্ষে যাহা অযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না, এমন কথা-সাহিত্য আমরা এখনও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের জীবিত ও পরলোকগত কথাকার ও নিবন্ধকারের মধ্যে অক্লেশে ১৫।২০ জনের নাম করিতে পারা যাইবে, যাঁহাদের রচনা পৃথিবীর যে-কোনও প্রৌঢ় ও উচ্চকোটির সাহিত্যের পক্ষেও গৌরবের বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ছেঁড়া চাটাইয়ের উপরে শুইয়া লাখ টাকার স্বপন দেখার মত আমরা এখন বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের—উনবিংশ শতকের—মধ্য-ভাগে যে-সমস্ত বড়-বড় সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্য মনীষীর আবির্ভাবে কলিকাতা ও বাঙ্গলা-দেশ ধন্য হইয়াছে—খ্রীষ্টীয় ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক স্বর্ণ-যুগের অধিকারী মহাকালের প্রসাদে আমরা হইতে পারিয়াছি, এখন সেই মহাপুরুষদের অবদান স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিবৎসর একটি বা একাধিক করিয়া শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় পূর্ব-স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব-জাতির সাহিত্যের ও সংস্কৃতির বিবর্তনে, মাত্র তিনটি বিভিন্ন দেশে তিনটি বিভিন্ন কালে এই অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল—এত অল্প সময়ে বিস্ময়কর ভাবে এতগুলি করিয়া বিরাট্ মনীষীর আবির্ভাব—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শাশ্বত চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদের প্রভাব সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে—যথা, (১) পেরিক্লেসের সময়ের খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের আথেনাই বা আথেন্স নগরীতে, (২) রাণী এলিজাবেথের সময়ের, ষোড়শ শতকের লণ্ডনে ও ইংলাণ্ডে, এবং শেষ (৩) ইংরেজ আমলে ১৮০০ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ও বাঙ্গলা-দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে। আমার মনে হয়, জাতি হিসাবে ইহাই আমাদের চরম দান—ভারতকে, এশিয়াকে, সমগ্র জগৎকে।

বার্ষিক বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনে নিশ্চয়ই আমাদের এই পিত্রাগত রিক্‌থের বিচার ও মূল্যায়ন করিবার সার্থকতা আছে, আবশ্যকতা আছে। অন্যান্য সাহিত্য-সম্মেলনে যেমন, এই সম্মেলনেও তেমনি যোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রগতির কথা আলোচিত হইবে। আন্তরিক কামনা করি, সেই-সমস্ত আলোচনা, জ্ঞানদীপ্ত সৌন্দর্যোদ্ভাসিত এবং পরিপূর্ণ হইয়া, ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত এই ষট্‌ত্রিংশত্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনকে সার্থক করুক ॥

(এই অভিভাষণ ঝাড়গ্রামে উদ্বোধনী সভায় পঠিত হইবার পরে, সভাপতি মহাশয় কর্তৃক কিয়দংশে পরিবর্ধিত হইয়া মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।)

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের হিতৈষী বান্ধব রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের ভাষণ

মাননীয় মূল সভাপতি, সাহিত্যিক, সুধীবৃন্দ ও ঝাড়গ্রামের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আমার মনে হয় আজকের এই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশনের উদ্বোধনের ভার কোন যথার্থ গুণী ব্যক্তির উপর অর্পিত হলেই সকল দিক দিয়ে শোভন হ'ত। কেন না, আমি সাহিত্যস্রষ্টা নই। সাহিত্যসেবী বলেও স্পর্ধা রাখি না। অন্তরের কথা জানিয়ে শুধু এই বলতে পারি যে, আমি বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসি। সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশের ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন অধিকার নাই এবং সেই অধিকার বলেই শত কুণ্ঠা, শত অক্ষমতা সত্ত্বেও দাঁড়িয়েছি আপনাদের সম্মুখে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আজকে এই উৎসবের পৌরোহিত্যে বরণ করবার সুযোগ পেয়েছি এমন একজনকে, যিনি সাহিত্যের বিচিত্র পথের পথচারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙে নূতন বান ডাকলো। বাংলা দেশে এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হল। বাঙ্গালীর মনীষা শতশিখায় জ্বলে উঠলো। বাংলা দেশে প্রতিভার দীপালি উৎসব শুরু হোল। সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্মিক সাধনায় বাঙ্গালীর প্রতিভার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা দিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের কীর্তি কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ সেই গৌরবময় যুগের অবসান ঘটেছে। সে যুগের জ্যোতির্ময় প্রতিভাধর পুরুষেরা একে একে বিদায় নিয়েছেন। আমার পূজনীয় মাস্টার মহাশয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ্ত প্রতিভা এখনো এই গৌরবময় যুগটির মহিমামণ্ডিত ঐতিহ্য জাগিয়ে রেখেছে। এই বর্ষীয়ান জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যরথীকে ও সমাগত সাহিত্যিক সুধীবৃন্দকে আমি আমার সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করি।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনই দেশের সারস্বত সমাজের যথার্থ মিলনভূমি। আজ আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি যে, এ হেন মহান প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত হয়েছে আমাদের এই সুদূর অনগ্রসর দারিদ্রক্লিষ্ট ঝাড়গ্রামে। বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ মানসে যে পুণ্যব্রত সম্মিলন গ্রহণ করেছেন তা সম্যক উপলব্ধি ক'রে ঝাড়গ্রামবাসী আজ প্রেরণা লাভ করবে এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য আজ তারা কৃতজ্ঞ। সম্মেলনের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার উপর শ্রীভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ইহাই কামনা করি।

এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার পুণ্য জন্মভূমি মেদিনীপুর জেলার অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। আজ যে মেদিনীপুরের সহিত আমরা পরিচিত সে মেদিনীপুর তার সমস্ত পূর্বতন ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস হারিয়েছে। তার বাণিজ্য সংস্কৃতি, তার ধর্মপ্রেরণা, তার যুদ্ধ বিশারদতা একসময় সমস্ত ভারতবর্ষ তথা সমস্ত পৃথিবীর অনুপ্রেরণা দানকারী ছিল। প্রাক্‌আর্য চরিত্রের তাম্রলিপ্ত হচ্ছে অন্যতম দ্রাবিড় সভ্যতার পীঠস্থান। সে যুগে তাম্রলিপ্ত ভারতের খ্যাতনামা অন্যতম নৌ-বন্দর ও নৌ-নির্মাণ কেন্দ্র। যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী জাতি সমস্ত পৃথিবীতে অমিতাভ বুদ্ধের শান্তি ও অহিংসার বাণী বহণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানের ঐশ্বর্য ও শ্রী চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েন্ ও হিউয়েন্‌সাঙকে স্তম্ভিত ক'রেছিল—যার খ্যাতি রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ভারতের তিনটি প্রদেশ বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার সংযোগ স্থানে অবস্থান হেতু বহু যুদ্ধের লীলাভূমি এই মেদিনীপুর। মোগল পাঠান শক্তির সহিত নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু হিন্দু রাজন্যবর্গ প্রাণ সমর্পণ ক'রেছেন এইখানে। ধর্মক্ষেত্রেও মেদিনীপুর অগ্রগণ্য তীর্থভূমি। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ নিজ পথ ও মতের সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ ও পার্শ্বনাথের মত ও পথের সহিত যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার পথে স্বীয় স্বর্গীয় প্রেম ও ভক্তিমূলক সংগীতে বিধৌত হয়েছিল এই মেদিনীপুর ভূমি। আমাদের এই ঝাড়গ্রামই পরম বৈষ্ণব শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের জন্মভূমি ও গোপীবল্লভপুরে তাঁর পীঠস্থান।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই। এই মেদিনীপুরেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের জনকপ্রতিম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের লীলাভূমিও এই মেদিনীপুর এবং আরও অনেক স্মরণীয় সাহিত্যিকের রচনা-ক্ষেত্রের স্মৃতিও এই মেদিনীপুরের বহু স্থানের সহিত জড়িত। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে মেদিনীপুরের সন্তানগণের অবদানও কম নয়। শহীদ ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজরা, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, রাজা দেবেন্দ্রলাল খান মহোদয় প্রভৃতি স্বাধীনত যুদ্ধের পুরোধা ছিলেন। শেষে বর্তমান ঝাড়গ্রামের রূপকার আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বর্গীয় দেবেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ না ক'রে শেষ করতে পারছি না—যিনি এই মেদিনী-পুর জেলার বহু সরকারী ও বেসরকারী উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থেকে নিজেকে নিঃশেষ করেছেন।

জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের প্রভাব নির্দেশ ক'রতে যাওয়া আমার মত অব্যবসায়ীর পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চা। শুধু সহজ বিচার বুদ্ধি বলে এই মনে হয় যে, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি নিগূঢ় সংযোগ আছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চললে সাহিত্য অলস কল্পনায় পরিণত হয়। এই জন্যই সাহিত্য যুগধর্মী হওয়া উচিত। আমাদের বর্তমান বাঙ্গালী জীবনের জীবন মরণ সমস্যাগুলি—বঞ্চিতের হাহাকার, হৃতশ্রী

পল্লীজীবনের নিরানন্দ—ইহারা কি বাঙ্গালী সাহিত্যিককে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে না ? আমার মনে হয় অবসাদ ভরা জীবনে আশার সঙ্গীত ধ্বনিত ক'রে তোলা, আত্ম-বিশ্বাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যের একটি প্রধান কাজ। এ সব কথা তুলে আমি আপনাদের সময় নষ্ট ক'রতে ইচ্ছা করি না। বক্তব্য শেষ করার আগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মাধ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন যে, ঝাড়গ্রামে তাঁদের একটি স্থায়ী সক্রিয় শাখা স্থাপন ক'রে এই অনগ্রসর ঝাড়গ্রামবাসীদের সাহিত্য-সেবার বা অনুশীলনের সুযোগ দিলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাহিত্যের সাধক আপনারা—আপনারা জাতির নমস্য। আপনাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করছি এবং যাঁরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন সেই কর্তৃপক্ষগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আসুন, বঙ্গভারতীর অর্চনা ক'রে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন কার্য সম্পাদনে আমরা ব্রতী হই। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হোন। জয় হিন্দ।

শ্রীনরসিংহ মল্লদেব

সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি।

ষট্‌ত্রিংশৎ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ঝাড়গ্রাম অধিবেশন।

আমাদের প্রভাতকুমার

বনফুল

(শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে যিনি সর্বপ্রথমে কুন্তলীন পুরস্কারে 'পূজার চিঠি' নামে গল্প লিখিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন, একদা রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ যাঁহাকে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত করে আমরা আজ বাংলা সাহিত্যের সেই অনুপম গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে এই সভায় সমবেত হইয়াছি তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য। এই সভার আয়োজন যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু হায়, আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন একটি বা একাধিক সভা করিয়াই শেষ হইয়া যায়। বস্তুত ইহার বেশী আর কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা বড় জোর রাজ্য-সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলীর একটি সস্তা সংস্করণ অথবা তাঁহার গল্পগুলির একটি চয়নিকা তাঁহারা বাহির করুন। আমাদের প্রচেষ্টা ইহার বেশী আর অগ্রসর হইবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অনেকে খেদ করেন সেকালের বড় বড় সাহিত্যিকদের একালের আত্মকেন্দ্রিক বাঙালীরা আজকাল ভুলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাঙালী হয়তো ভুলিয়াছে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বাঙালীরা ভোলে নাই। সর্বকালে সর্বদেশে এই রসিকদের নাতিবিস্তৃত জগতেই প্রকৃত স্রষ্টার, নিষ্কলুষ সাহিত্যিকদের মর্যাদা চির অম্লান। সে জগতে রসস্রষ্টা প্রভাতকুমার শ্রদ্ধার সিংহাসনে আজও সমাসীন আছেন। যে প্রভাতকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'ছোট গল্প লেখায় পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন। তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মতো—।' যে প্রভাতকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন—তোমার গল্প আমার খুবই ভালো লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকদের অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে। —সেই প্রভাতকুমারকে প্রকৃত সাহিত্যরসিক বাঙালীরা আজও মনে রাখিয়াছে। এই সভার উদ্যোগ তাঁহাদেরই চেষ্টায়। রামা-শ্যামা-যদু-মধুর দল তাঁহাকে মনে রাখে নাই বলিয়া খেদ করিবার প্রয়োজন নাই। লণ্ডন শহরে সেক্সপীয়রের নাম শোনে নাই এমন লোকের কথাও একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছি। ইহাই স্বাভাবিক। মুর্গির নিকট মুক্তোর দানা অপেক্ষা গমের দানা বেশী মূল্যবান। মুর্গির চক্ষে মুক্তোর দানা বাজে জিনিস। সুতরাং মুর্গিদের জগতে মুক্তোদানা কেন অনাদৃত ইহা লইয়া হা হুতাশ করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। যাঁহারা জহুরী তাঁহারা যথার্থ মুক্তার যথার্থ মূল্য চিরকাল দিয়াছেন।

প্রভাতকুমার অধিকাংশ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মতো কবিতা দিয়াই সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মুখ্যতঃ তিনি তাঁহার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসগুলির জন্য বিখ্যাত। ত্রিশখানি গল্প-সংগ্রহ ও উপন্যাস তাঁহার কীর্তি বহন করিতেছে। তাঁহার

লেখার বৈশিষ্ট্য তাঁহার ভাষার স্বচ্ছতা, গল্পের প্লটের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি তাঁহার সকল রচনার মধ্যে হাস্য-ব্যঙ্গের সু-মধুর ফল্গুধারা। বাংলার গল্প-সাহিত্যে আর একটি অভিনবত্ব তিনি আনিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে বিলাত-ফেরত এবং বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের একটি নিখুঁত সরস চিত্র তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব এ চিত্র তিনিই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে আঁকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভাতকুমারের সাহিত্যের দীর্ঘ-আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। সেকালের 'দাসী' 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার রচনা প্রকাশ করিয়া যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা এ যুগে দুর্লভ। এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও না কি হোমরা চোমরাদের সুপারিশ না থাকিলে নবাগত সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশিত হয় না। সে যুগে এ সব ছিল না। তাই বিলাত প্রবাসী প্রভাতকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের পীঠস্থান কলিকাতা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়। কলিকাতা শহরে বসিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন এ রকম সাহিত্যিক বেশী নাই। এক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কাহারও নাম তো মনে পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই কলিকাতার বাহিরে থাকিয়াই তাঁহাদের মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার শেষ জীবনে 'মানসী ও মর্মবাণী'-র সম্পাদক এবং ল কলেজের অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছিল কলিকাতার বাহিরে—জামালপুরে, সিমলায়, দার্জিলিঙে, রংপুরে এবং গয়ায়। তাঁহার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন ই. আই. রেলের একজন সিগনালার। পিতার সহিত প্রভাতকুমার অনেক রেল-স্টেশনে ঘুরিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গল্পে রেলওয়ে ষ্টেশন এবং রেলের কর্মচারীরা জীবন্ত। তাঁহার বিখ্যাত আত্রতত্ত্ব গল্পটির অন্তরালে হয়তো প্রত্যক্ষ দর্শনের কোনও প্রেরণা আছে। রসিক প্রভাতকুমারকে, রসস্রষ্টা প্রভাতকুমারকে, স্বল্পভাষী প্রভাতকুমারকে, শিষ্টাচার সম্পন্ন প্রভাতকুমারকে, নিরহঙ্কার সুমিষ্ট স্বভাব আত্মগোপন প্রয়াসী প্রভাতকুমারকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। শুধু লেখক হিসাবে নহে মানুষ হিসাবেও তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি রসিক সমাজকে যে আনন্দ একদা দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতিদান দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা শুধু বলি—

তুমি আমাদের আপনার লোক ছিলে
মোরাও তোমার আপনার লোক আছি,
মৃত্যু তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক
আমরা কিন্তু আছি অতি কাছাকাছি।

প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই—রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা প্রায় আমাদের অজ্ঞাতসারেই উচ্চারণ করে থাকি। আমরা প্রভাতকুমার বলতে বুঝি ছোটগল্পের-লেখক। এবং বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎকর্ষ বিষয়ে যখন তারতম্য বিচার করতে বসি তখন—'তম' যে রবীন্দ্রনাথের নামাশ্রিত হবে তাতে কারও দ্বিমত হয় না। —'তর' সম্পর্কেও দ্বিমত নেই। রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়, প্রভাতকুমার দ্বিতীয়। সে দ্বিতীয়তায় কোনো অগৌরব নেই। লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। গদ্যের পথে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রায় হাতে ধরে নামিয়েছেন। দূরদর্শী গুরুর মতই তিনি প্রভাতকুমারের প্রতিভার প্রকৃতিটি বুঝতে পেরেছিলেন বলে তাঁকে ঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শিষ্যও বিনা প্রতিবাদে সে পথ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন সে আমাদের সৌভাগ্য। নইলে বাংলা সাহিত্য একটি দুর্লভ ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হত। প্রভাতকুমারের পর আরও অনেক শক্তিমান্ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে। ছোট গল্পের শাখাও ফুলে ফলে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। তবু একথা সকলেই স্বীকার করবেন তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্য যা পেয়েছে আর কারও হাতে তা পায়নি।

সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের যোগাযোগ কবে হয়েছিল? কি ভাবে হয়েছিল? —জানবার জন্যে কৌতূহল হয়। আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে তার থেকে এইটুকু মাত্র জানলাম যে প্রভাতকুমার কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। জেনেছি তাঁর নিজের জবানিতে।

"রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম 'কবিতার মা বাপ নাই, যা খুশী লিখিয়া যাই—কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন; সে পাণ্ডিত্য আমার কই?' ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমতো আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া সমালোচনা হউক প্রবন্ধ হউক গল্প হউক একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি।'"

রবীন্দ্রনাথের কথার ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলেছিল। তিনি একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখলেন; রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা। সমালোচনাটি ছাপা হল 'দাসী' পত্রিকায়। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। একটি গল্পও লিখলেন, 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'। সেটি বেরোল 'প্রদীপ' পত্রিকায় ছদ্ম নামে।

গল্পের কথা লেখক রবীন্দ্রনাথকে জানান নি। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীর সম্পাদক। তিনি 'ভারতী'-তে 'প্রদীপে'-র ওই সংখ্যাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'রাধামণি দেবী'-র নামাঙ্কিত গল্পটির সুখ্যাতি করেছিলেন। 'রাধামণি দেবী'-র নামে আরও একটি গল্প মুদ্রিত হল ওই 'প্রদীপ' পত্রিকাতেই কয়েক মাস পরে। নাম 'বেনামী চিঠি'। রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে এই গল্পটির প্রশংসা করেন। প্রভাতকুমার তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন,—"রবিবাবু এবারও ভারতীতে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর প্রদীপে নিজমূর্তি ধরিয়া বাহির হইলাম।"

রবীন্দ্রনাথের অযাচিত প্রশংসায় প্রভাতকুমারের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। আমাদের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা যতটা অযাচিত ছিল ততটা 'অজানিত' ছিল কি না। 'রাধামণি দেবী' যে প্রভাতবাবুর ছদ্মনাম এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি না। প্রভাতবাবু বলেছেন এই নামটির প্রতি তাঁর একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। সে মায়ার কারণটিও কৌতুকাবহ। সেটি এই।—আগের বছর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি'। পূজোর ছুটিতে স্বামী বাড়ি আসবেন। স্ত্রী তাঁকে এটা সেটার সঙ্গে এক বোতল কুন্তলীন কেশ তৈল আনার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখছে। এই হল প্রস্তাবিত 'পূজোর চিঠি'র বিষয়। প্রভাতকুমার রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে একটি পত্র রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রটিই প্রথম পুরস্কার পায়। সেই কারণেই নামটির উপর নাকি তাঁর মায়া বসে যায় এবং পরেও গল্পের ছদ্মনাম হিসেবে এটির ব্যবহার করেন।

কিন্তু ছদ্মতার আবরণ যে বেশী দিন আসল নামটিকে ঢেকে রাখতে পারে নি, সেটাও তাঁরই মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি। কুন্তলীনরা জানতে পেরেছিলেন যে, 'রাধামণি দেবী' প্রভাতবাবুরই ছদ্মনাম। তারপর থেকে তাঁরা পুরস্কার ঘোষণার সময় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ছদ্মনাম ব্যবহার করলে পুরস্কার পাবেন না।

কুন্তলীনরা যা জানতে পেরেছিলেন এবং যে কারণে জানতে পেরেছিলেন সে ঘটনা এবং তার কারণ সেদিনকার সাহিত্যসমাজে কখনো অজ্ঞাত থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কানে সে সংবাদ না ওঠাটা সম্ভব মনে হয় না। তবে প্রভাতবাবু তাঁর স্নেহের পাত্র। তিনি যেটা গোপন রাখতে চান কবি সেটা জেনেও তাঁকে জানাতে চান নি।

প্রভাতকুমার বলছেন, "তখন আমি ছিলাম 'কবি', সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া ...একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম।" 'সুতরাং' নামক সংযোজক অব্যয়টি থেকেই বুঝতে পারি—তিনি তখন আপন কবিত্ব গৌরব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। যতই নিজেকে বিদ্রূপ করুন তাঁর কবিতা সেদিনকার পাঠকসমাজে নিতান্ত অপাংক্তেয় ছিল না।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা দেখেছেন এবং সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তার মধ্যে লেখকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির বলে বুঝেছেন এই শক্তিকে কবিতার চেয়ে গল্পের খাতে বহাতে পারলে সবার লাভ। বঙ্গভূমি যতই ক্ষুদ্র হোক, কাল যখন নিরবধি তখন কবির অভাব হবে না। কিন্তু দুই বা তিন নম্বরের শতসংখ্যক কবির চেয়ে এক নম্বরের একটি গদ্যলেখকের প্রয়োজন বেশী এবং তাঁর ধারণা প্রভাতকুমারের দ্বারা সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের কবিতা দেখে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে আশান্বিত হয়েছিলেন। এটা আমার অনুমান বটে কিন্তু অনুমানের পিছনে কিছু হেতুও আছে। সবিনয়ে নিবেদন করি।—

সেদিনকার কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ সমাজে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর অভাব ছিল না। প্রভাতবাবু ছিলেন অনুরাগী-সম্প্রদায়ের অন্যতম। তাঁর কুড়ি একুশ বছর বয়স থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা শুরু করেন। প্রথম কয়েকটি চিঠি বিনা স্বাক্ষরে বা ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল। (দেশ ১৩৭৫, সাহিত্য সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের পত্র) এই সকল পত্রে তিনি কবির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের অনুরাগী পাঠক রূপে কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে তাঁর একটি ছবি পাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রভাতকুমারের প্রথম স্বাক্ষরিত চিঠির তারিখ ১১ মাঘ ১৩০১ (জানুয়ারি ১৮৯৫)। এই চিঠির পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। 'সাধনা' পত্রে প্রভাতকুমারের একটি কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের মাঘ মাসে। তার দু-মাস আগেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদকত্বে যে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেই পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির চিহ্ন তাতে আর সন্দেহ থাকে না। প্রভাতকুমার সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবার আত্ম-প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে তাঁর পত্রিকায় যে কবিতাকে স্থান দিয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে সেটি নিতান্ত শিক্ষার্থীর রচনা নয়। বাল্যকাল থেকেই প্রভাতকুমার কবিতার চর্চা করেছেন তার প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণও দেওয়া যায় যার থেকে দৃঢ় অনুমান হয় যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েই তিনি কাব্যরচনা করতে আরম্ভ করেন। পয়ার ত্রিপদী মাত্র নয় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নূতন নূতন ছন্দ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'মানসী'র ভূমিকায় কবি বলেছেন, "মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।" প্রভাতকুমার রবীন্দ্র কাব্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। পাঠক হিসেবে তাঁর যে কেবল অনুরাগই সম্বল ছিল তা নয় বিচারবুদ্ধিও ছিল সুতীক্ষ্ণ। তাঁর গোড়ার দিক্‌কার কবিতাতেও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দের প্রয়োগপরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ

সম্বন্ধে কৌতূহলী নবীন লেখকের একটি মুদ্রিত কবিতার নাম "চিরনব"। ব্রজেনবাবু (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৫৪) মনে করেন এইটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। প্রথম না হয়ে পঞ্চম হলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু এটি যে তাঁর ১৭ বছর বয়সের পূর্বে রচিত নয় তাতে সংশয় নেই কারণ "ভারতী" ও বালক" পত্রিকার ১২৯৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটির ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করে দেখাই।—

ক্রমশঃ ধরাখানি সজীব হয়ে উঠে,
যে যার কায পানে সকলে যায় ছুটে।
লোহিত রঙ্ মাখা যে দিকে নভঃখানি,
সে দিকে চেয়ে থাকি উঠিবে দিনমণি।
হেরিয়া সেই শোভা মোহিত হয়ে থাকি,
উথলি উঠে হিয়া ভরিয়া যায় আঁখি।
বিষাদে দিনমণি ক্রমশঃ লাল লাল,
সরোজি কাঁদে বসি রাঙিয়ে দুটি গাল।
গাভীরা মাঠে থেকে আবাসে আসে ফিরে,
কৃষক তার পাছে লাঙল লয়ে শিরে।
পাখীরা গাছে বসে পূরবী গেয়ে গেয়ে,
ঘুমায়ে পড়ে ত্বরা মাথাটি নীড়ে থুয়ে।

ছন্দটি সাত মাত্রার, তিন-চার তিন-চার করে। লাইনে চোদ্দ মাত্রা থাকলেও পয়ার নয়। এই ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেটি এই :—

তরণী বেয়ে শেষে এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই জলে না দিন কাটে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বালক প্রভাতকুমারের কবিতার ছন্দের সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। রবীন্দ্রনাথ দুইমূলক সমমাত্রার সঙ্গে তিন মূলক অসমমাত্রার পার্থক্য দেখানোর জন্যে এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। পয়ার চলে দুইমাত্রার চালে, এর চাল তার বিপরীত। এর পা ফেলার ভাগ অসমান। "এর এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে। কিন্তু বিজোড় অঙ্কের অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্য সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এই রকম ছন্দের রচনা।"

এ ছন্দ নবীন শিক্ষার্থীর ব্যবহারযোগ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট

বোঝা যায়। কিন্তু প্রভাতকুমার তাঁর পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সে অনুমান অস্বাভাবিক নয়। 'বধূ' কবিতাটির কথা ভাবুন। বধূ পুরোপুরি এই ছন্দে রচিত না হলেও, সাত মাত্রার প্রয়োগ এতে বহুল পরিমাণে করা হয়েছে। যেমন,—বেলা যে পড়ে এল, পুরানো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে, কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে বাঁধাঘাট, ছিলাম আনমনে, একেলা গৃহকোণে, কে যেন ডাকিলরে, ইত্যাদি। 'বিরহানন্দে' কবিতাটিও স্মরণযোগ্য। এখানেও সাতমাত্রার ব্যবহার হয়েছে এবং লাইনের উভয় অর্ধেই সাতমাত্রার ব্যবহার, তবু উভয় অর্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত দিই।—

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহ তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত;
অটবী বায়ু বশে উঠিত সে উছাসি।

প্রতি লাইনের প্রথমার্ধে ৩+৪, দ্বিতীয়ার্ধে ৪+৩। প্রভাতকুমার প্রথমার্ধের মাত্রা বিভাগ উভয়ার্ধেই প্রয়োগ করেছেন।

১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা সাধনায় তাঁর কবিতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই—কবি হিসাবে সাহিত্য সমাজে প্রভাতবাবুর পরিচয় অবশ্যই ঘটেছিল। তার পূর্বে নানা পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় কবি হিসেবে তিনি তখনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হবার পরেও প্রভাতকুমার কাব্য চর্চা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত হন নি। ১৩০৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে—'অভিশাপ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে যখন করণিকের চাকরি নিয়ে সিমলায় যান তখনও কবিতা লেখা চলছে, এবং ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে সে কবিতা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি।—

"প্রিয় বরেষু, আমি এখন একটি ছোট নদীর উপরে, বোটে। বর্ষা তাহার সমস্ত বিপুল উপকরণ লইয়া বাঙ্গালার এই প্রান্তবর্তী নবোদ্গত ধান্যাঙ্কুর পুলকিত পল্লীটির উপর আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে—এখানে তাহাই লইয়া জলে স্থলে আকাশে যে ধুম পড়িয়া গিয়াছে তোমাদের সিমলার রাজদর্পোদ্ধত শিখরে তাহার বেশি আর কি হইবে?

তোমার এবারকার কবিতা আষাঢ়ের ভারতীতে ছাপার জন্য পাঠাইলাম এখনো যদি জায়গা থাকে তো বাহির হইবে—নতুবা পরের ট্রেণ, শ্রাবণের 'ভারতী'র জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।" এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে এই সিমলায় অবস্থানের সময় তিনি 'সিমলা-শৈল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি চিত্র-সহযোগে ১৩০৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা প্রদীপে প্রকাশিত হয়েছিল।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমার কবিতার স্বর্গ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে গল্পের মর্ত্যলোকে অবিস্মরণীয় আসন গ্রহণ করলেন। প্রভাতবাবুর প্রথম গল্পসংকলন 'নবকথা' প্রকাশিত হল ১৩০৬ সালে (১৮৯৯)। এতে সর্বসুদ্ধ এগারটি গল্প ছিল, রচনার কাল—১৩০৩ থেকে ১৩০৬।

বার বছর পরে 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের সাহিত্য সৌহার্দ্য তখনও অব্যাহত আছে, বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে। 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোলে প্রভাতকুমার একখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লেখেন—

"ভাবিলাম সব গল্পই তো পূর্বে পড়া হইয়াছে ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না, তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে শুরু করিলাম—দেখিলাম মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন। তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারী—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে। বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

প্রভাতকুমারের শিল্পপ্রতিভা তাঁকে কালজয়ী করেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভাই তাঁর সাফল্যের একমাত্র কারণ নয় তার সঙ্গে অবিরাম সাধনাও ছিল। যে-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল নিরলস। এবং তাঁর সে চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সহায়তার কখনো অভাব হয় নি। ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে লিখিত একটি পত্রে প্রভাতকুমার প্রশ্ন করেছিলেন,—"ছোট গল্পে কথোপকথনের মাত্রা কতটা indulge করা যাইতে পারে? কোনও একটা মনের ভাব ফুটাইতে হইলে, লেখক নিজের জবানী সেটাকে জানায়, কিংবা পাত্র পাত্রীর মুখে পাঠককে জানিতে দেয়। কোনটা প্রশস্ত? অবশ্য দুই চাই। এ সম্বন্ধে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে নাটকের province encroach করা স্বরূপ পাপ স্পর্শ করে কি না, আমার গল্পে আমি যতটুকু কথোপকথনের আশ্রয় লই, তা too little কিম্বা too much যে side—এই হউক, দোষের বিবেচনা করেন কি না, সংশোধন আবশ্যক মনে করেন কি না।

"দেখুন কোনও একটা complex মনের ভাব ফোটানো, তাহা action এবং

কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় না কি? লেখক তাহাকে আগাগোড়া delineate করিতে চেষ্টা করিলে হয়তো একটু tedious হয়। আপনি কি মনে করেন?" লেখক পত্রের উপসংহার করেছেন এই ব'লে, "আমার ভারি ইচ্ছা আপনি ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।"

এ পত্রের উত্তরে ছোট গল্প বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ আসে নি, কিন্তু তার বদলে এসেছিল একটি স্নেহ-উপহার—সদ্য প্রকাশিত 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের একটি প্রতিলিপি।

প্রভাতকুমার এই উপহারের প্রাপ্তিস্বীকার করে যে চিঠি লিখছেন তাতে বলছেন,—

"আপনার স্নেহ উপহার 'কাহিনী' প্রাপ্ত হইলাম। 'কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ' অতি সুন্দর লাগল।···দেবী 'ভারতী'-র পুরোহিতাকে (সরলা দেবী) উৎকোচ দিয়া 'চিরকুমার সভা' পাণ্ডুলিপিতেই পড়িয়া লইয়াছি। উহা মধু এবং গুড় কোনওটাতেই পড়ে নাই বটে, কারণ উহা নেবু দেওয়া বরফ দেওয়া সরবত।"

চিরকুমার সভা নামক সামাজিক গল্পটির মধ্যে প্রভাতকুমারের প্রশ্নের বোধ হয় আংশিক উত্তর আছে। এই গল্পে কথোপকথনের পরিমাণ খুব বেশী। প্রভাতবাবুর ভাষায় বলব গল্প এখানে নাটকের province-এ অনেকখানি encroach করেছে। এতখানি encroach করেছে যে এই বইটির নাট্যরূপ দেওয়া খুবই সহজ হয়েছিল।

যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বালক প্রভাতকুমারের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহ ও সম্প্রীতি তিনি অজস্র পরিমাণে লাভ করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : (১৮৭৩—১৯৩২)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমারের দান অবিস্মরণীয়। ভালো লেখক মাত্রেরই একটি নিজস্ব ভঙ্গী থাকে, প্রভাতকুমারেরও আছে। সেটি কি, নির্দেশ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো কল্পনার ঐশ্বর্য বা 'অতিথি'র মতো সূক্ষ্ম সঙ্কেত তাঁর গল্পে নেই। কিন্তু একটি স্নিগ্ধ সকৌতুক ঘরোয়া পরিবেশ গল্পের পাত্রপাত্রীকে যেন সহজে মনের কাছে নিয়ে আসে, বিনা আড়ম্বরে চিনিয়ে দেয়। গল্প বলবার কৌশলটি তাঁর এমনি আয়ত্ত যে যা নিয়েই বলুন, শ্রোতাকে বশ করে নিতে তাঁর দেরি হয় না। তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই ঘটনা নির্ভর। আজকালকার গল্পে অনেক সময়ে 'গল্প'ই খুঁজে পাই না। বাহাদুরির চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দেয়। অবাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ, অসুস্থ চিন্তার উত্তেজনা মনোবিকারের সুদীর্ঘ বিবরণ—পাঠকের মনকে অযথা ক্লিষ্ট করে তোলে। যাকে একালে 'চেতনা-প্রবাহ' বা 'ষ্ট্রীম্ অব্ কন্শাস্নেস্' বলি, তারও দৃষ্টান্ত পাই অনেক গল্পে। অসার বিবরণ চলেছে পাতার পর পাতা। না আছে ঘটনার আকর্ষণ, না আছে চরিত্রের দীপ্তি, না আছে জীবন-রসের স্বাদ। এতে হৃদয় তৃপ্তি পায় না। বুদ্ধিবিলাসী হয়তো বলবেন, হৃদয়ের সাহিত্য এ যুগের জন্য নয়, এ যুগ বিচার-বিশ্লেষণের। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণও যে খেয়ালের খেলা নয়, তাই বা ক'জন মনে রাখেন ? ভূয়োদর্শন বা প্রভূত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যথার্থ বিচার সম্ভব। পুঁথির পাতা বা শব্দ-সমষ্টির কোনও মর্যাদা নেই সাহিত্যে, যদি না তাতে অন্তরের স্পর্শ পাই।

যাই বলি, সাহিত্য নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বস্তু নয়। জীবনের ছবি তাতে দেখতে চাই, জীবনের রস উপভোগ করতে চাই। প্রভাতকুমারের গল্পে তারই আয়োজন।

* * *

সংক্ষেপে তাঁর জীবন কথা স্মরণ করি। ১৮৭৩ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ১২৭৯ সাল, ২২ মাঘ, বর্ধমান ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার গুরুপ গ্রামে। পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় সামান্য রেল-কর্মচারী ছিলেন। প্রভাতকুমার জামালপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ্. এ. ও বি. এ পাস করেন। অতঃপর কিছুদিন শিমলায় সরকারী অফিসে এবং কলকাতায় ডিরেক্টর জেনারাল অব টেলিগ্রাফ্স্-এর অফিসে কেরানি গিরি করেন।

এফ্. এ. পাসের পূর্বেই ব্রজবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু ছ' বৎসরের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। তিনি আর বিবাহ করেন নি। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সম্পাদিকা সরলা দেবী তাঁর প্রতিভার অনুরাগিণী ছিলেন। উভয়ের বিবাহের কথাবার্তাও নাকি হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি।

ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে প্রভাতকুমার কাউকে কিছু না জানিয়ে বিলেতে পাড়ি দেন। পাস্ ক'রে এসে দার্জিলিঙে, রংপুরে এবং শেষে গয়ায় প্র্যাকটিস্ করেন। এ কাজে তাঁর মন বসেনি। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রের সহযোগী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে সাহিত্য সেবাতেই তিনি একান্তভাবে মন দিয়েছিলেন। শেষের দিকে প্রায় ষোলো বৎসর তিনি ল' কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্যারিস্টারিতে তাঁর মন বসুক বা না বসুক, তাঁর বহু গল্প উপন্যাসেই উকিল বা ব্যারিস্টারের সাক্ষাৎ পাই, আর পাই সংসারের নানারকম মানুষ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয়।

* * *

বহু বাঙালী সাহিত্যিকের মতো তিনিও সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। ভারতী, দাসী, প্রদীপ প্রভৃতি মাসিক পত্রে তার অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপরে লেখেন গল্প ও উপন্যাস। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ছোট গল্পে। কোনোটি হাস্যমধুর, কোনোটি অশ্রুকরুণ। মজার মজার ব্যাপার তাঁর গল্পে প্রায়ই ঘটতে দেখি, অথচ সেগুলি অবাস্তব বা কষ্টকল্পিত নয়। যেমন, 'আত্মতত্ত্বে' ডি. সুজা সাহেবের কাণ্ড। তিনি রেলের গার্ড। প্যাসেঞ্জার-গাড়ি নিয়ে চলেছেন। ব্রেকভ্যানে অসংখ্য ল্যাংড়া আমের ঝুড়ি। সকালের খাওয়াটা ভালো হয় নি, ক্ষিদেও পেয়েছে, পাকা আমের গন্ধে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ঝুড়ি থেকে আম বের করে, কিছু খেয়ে, কিছু বিলিয়ে, শেষ পর্যন্ত টুক্‌রো পাথর দিয়ে আবার ঝুড়ি ভর্তি করে ডিউটি শেষ করে তিনি বাড়ী ফিরলেন। পরদিন তাঁর মা জানালেন, তাঁর হবু শ্বশুর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুড়ি খুলে পাওয়া গেল শুধু পাথরের টুক্‌রো। গার্ড সাহেব আম বার ক'রে নেবার সময় তো লেবেলের দিকে তাকাননি, যে ঝুড়ি তাঁরই কাছে আসছিল। তারই থেকে দু'হাতে আম বিলিয়ে এসেছেন এবং নুড়ি দিয়ে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ করেছেন। এমন করে নিজেই নিজের হাতে জব্দ হবেন, তা কি আর জানতেন ?

'মাস্টার মশাই' সুপরিচিত গল্প। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে দুই গ্রামে ইংরেজী স্কুল খোলা নিয়ে রেষারেষি। কোন্ গ্রামে ভালো ইংরেজী জানা মাস্টার এসেছেন, তা নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নন্দীগ্রামের হারান চক্রবর্তী আর গোঁসাইগঞ্জের ব্রজগোপাল মিত্র। দু'জনেরই মুখে ইংরেজীর খই ফোটে। কে বেশী জানে, তার পরীক্ষা হবে দুই গ্রামের অধিবাসীদের সামনে, সীমান্তবর্তী বটগাছতলায়। গ্রামবাসীরা যদিও ইংরেজী জানেনা, তবু কে কা'র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন বা না পারলেন, তা তো বুঝতে পারবে। হারান মাস্টার প্রশ্ন করলেন, 'হর্নস্অব্ এ ডিলেমা' অর্থ কি ? বেজো মাস্টার বলে দিলেন, 'উভয়-সঙ্কট'। কিন্তু বেজো মাস্টারের প্রশ্নে হারানমাস্টার কুপোকাৎ। 'আই ডোণ্ট নো' মানে যেম্‌নি তিনি বললেন, 'আমি জানি না', অমনি গোঁসাই গঞ্জের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,

দুয়ো দুয়ো, জানেনা, বলতে পারেনি। আসল রহস্য নন্দীগ্রামের লোকদের বোধগম্য হ'লনা। সভা ভেঙে গেল। হারান মাস্টার মুখ চুণ করে বিদায় নিলেন।

আবার, 'রসময়ীর রসিকতা'। বাক্যজ্বালায় স্বামীকে ঘরছাড়া ক'রে রসময়ী পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ক্ষেত্রমোহনও সংকল্প করলেন, আর সাধাসাধি নয়, তিনি অন্যত্র বিবাহ করবেন। কিন্তু যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সেখানেই রসময়ী গিয়ে ভাঙ্‌চি দেন, উৎপাত শুরু করেন : মাস ছয়েক পরে রসময়ীর মৃত্যু হল। বিয়ের উদ্‌যোগ চলেছে। ক্ষেত্রবাবু ভেবেছিলেন, এখন তাঁর পথ নিষ্কণ্টক। কিন্তু অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। একের পর পর এক রসময়ীর হাতে লেখা চিঠি আসতে লাগল। তার সারমর্ম : রসময়ী বটগাছে বাসা বেঁধেছেন। বিয়ে করলে রক্ষে নেই, বাসর ঘরে তিনি আগুন লাগিয়ে দেবেন এবং ক্ষেত্রবাবুর ঘাড় মটকে খাবেন। অদ্ভুত ভূতুড়ে রহস্য। পরে জানা গেল, নানা অবস্থা কল্পনা ক'রে কতকগুলি চিঠি লিখে রসময়ী তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং সময়মত এক একখানি ডাকে ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা থেকেই বহু রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব।

'বলবান্ জামাতা'ও চমৎকার হাসির গল্প। নলিনীভূষণ সুদর্শন, কিন্তু তাঁর নামও যেমন মেয়েলি, চেহারাটিও তেমনি। দিব্য কোমল, নধর কান্তি। তা নিয়ে বিয়ের সময় বিদুষী শ্যালিকা ছড়া বেঁধেছিলেন। নলিনীর মনে মনে রাগ হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেপ, শরীর ভালো না ক'রে আর তিনি শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। নিয়মিত ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর খাদ্যে দেহ মজবুত হ'ল, হাতের পেশী শক্ত হ'ল, তার উপর, তিনি গালপাট্টা দাড়ি রাখলেন।··· বহুদিন শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হয়নি। ডাক-বিভাগের চাকুরি, দু' তিনবার চেষ্টা ক'রেও ছুটি পাননি। অবশেষে যখন ছুটি পেয়ে গেলেন, তখন বিভ্রাট ঘটল। তিনি টেলিগ্রাম ক'রে গিয়েছিলেন. কিন্তু তাঁর যাবার খবর যথাসময়ে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছায়নি। এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী। সে শহরে তখন দু'একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। গালপাট্টাওয়ালা কে এক পালোয়ান জামাই পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চায়, শুনে বাড়ীর কর্তার সন্দেহ হ'ল, এও ডাকাত। তিনি দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে। ক্ষুব্ধ চিত্তে নলিনী ষ্টেশনে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রামটি এলো। মেয়েরা বললেন, তা হ'লে হয়তো জামাই-ই এসেছিল। 'তাই তো, তাই তো' করতে করতে কর্তা জামাতা বাবাজীকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। মান অভিমান অন্তে মধুর মিলনে গল্প সমাপ্ত হ'ল।

এমন বহু গল্প আছে, যার আখ্যান নতুন ধরণের, বর্ণনা সহজ সরল অথচ অব্যর্থ যাতে পাঠকের বুদ্ধি পরীক্ষার মতলব নেই, অনাবশ্যক ভনিতা নেই, মনের আনাচে কানাচে অবৈধ প্রবৃত্তি খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা নেই। অনাড়ম্বর বলেই এ গল্প এমন তৃপ্তিকর। কেবল হাসির গল্প নয়, করুণ গল্পও তাঁর অনেক আছে। সেগুলিও সাবলীল এবং মর্মস্পর্শী।

'ভিখারী সাহেব' একটি অসামান্য কাহিনী। ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার অনবদ্য উজ্জ্বল চিত্র 'আদরিনী'। মানুষ তার পোষাহাতীকে ভালোবাসে, হাতীর ভালোবাসাও যে কত গভীর ও আন্তরিক হ'তে পারে, তার নিদর্শন এ গল্পে আছে।

'দেশী ও বিলাতী' নামক গল্প-গ্রন্থ এক সময়ে খুব খ্যাতি অর্জন ক'রেছিল। এর দশটি গল্প দেশীয় জীবন-চিত্র, আর চা'রটির ঘটনাস্থল বিলেত। বহির্দেশের কথা নিয়ে গল্প বোধহয় বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন। বিষয়ের নূতনত্বের জন্য শেষোক্ত গল্পগুলি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটাশ—তেরোখানি ছোটগল্পের সংগ্রহ, চৌদ্দখানি উপন্যাস আর 'অভিশাপ' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য। তা ছাড়া বারো জনের লেখা 'বারোয়ারী উপন্যাস'-এর তিনটি পরিচ্ছেদ তাঁর লেখা। 'বিলাত-ভ্রমণ' তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেরিয়েছিল। কবিতা এবং সমালোচনা প্রবন্ধও তিনি অনেক লিখেছিলেন। তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন মাসিকপত্রে ছড়িয়ে রয়েছে।

উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রমাসুন্দরী'তে পাই একটি দুরন্ত গ্রাম্য মেয়ের মনোরম চিত্র। 'রত্নদীপ'-এ গার্হস্থ্য জীবনকে ঘিরেছে জটিল চক্রান্ত জাল। 'সিন্দূর কৌটা'য় বাঙালী খ্রীষ্টান মেয়ের আন্তরিক মাধুর্য ও ঔদার্যের কাহিনী। 'নবীন সন্ন্যাসী'তে আদর্শবাদী সংসার-বিরাগী যুবকের পবিত্র প্রেম পারিপার্শ্বিক গ্লানি-মলিনতাকে লজ্জিত করে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। 'মনের মানুষ'-ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক ; আপাত অলৌকিক রহস্য শেষ পর্যন্ত বাস্তব ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এসেছে। কোনও সামাজিক আদর্শ প্রতিপাদন বা তত্ত্ব-উদঘাটন তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্রতিটি কাহিনী ঘটনা-বিন্যাসে ও সহজ শুচিতায় উপভোগ্য।

তাঁর জন্মের শতবর্ষ-উপলক্ষে এই স্মরণ-সভার আয়োজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। বিশেষতঃ এ কথা স্মরণীয় যে তাঁকে সহকারী সভাপতিরূপে পেয়ে পরিষৎ একদিন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিল।*

* পরিষদ্-ভবনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে

শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রগতির চাকা ঘুরছে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে সর্বশক্তি নিয়োগ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই। এ বিষয়ে অধিক লেখার প্রয়োজন নেই। কি কি উপায়ে আমরা নিজেদের নিযুক্ত করব সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। আমরা এই প্রবন্ধে আর একটি মাত্র উপায়ের কথা আলোচনা করছি।

বিজ্ঞানের কোন জাতি নেই, আন্তর্জাতিক সীমারেখা নেই। দ্রুত ভাব বিনিময়ের ফলে নবতম বিজ্ঞান ধারণাকে আত্মসাৎ করতে কোন বাধা নেই—এর জন্য অনুবাদ হল সহজতম পন্থা। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য তথ্য পরিবেশন। এক্ষেত্রে রচনা শৈলী বা ভাষার সৌকর্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। লেখক এক্ষেত্রে গৌণ বা উহ্য, তাঁর বক্তব্যটাই একমাত্র বিবেচ্য। এজন্য মনে হতে পারে বিজ্ঞান অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। এটা সর্বাংশে সত্য বলা যেতে পারে না। বিজ্ঞান অনুবাদের ভাষা এত স্পষ্ট হওয়া দরকার যাতে কোথাও ব্যাখ্যা বা টিকা টিপ্পনীর প্রয়োজন না হয়। এমনকি দ্ব্যর্থবোধক শব্দও এখানে অচল। অত্যন্ত ঋজু সংযত এবং বলিষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞান ধারণা অনুবাদের পক্ষে সহায়ক। এই অনুবাদের ভাষা হওয়া দরকার সমগ্র ব্যঞ্জনাবাহী ও নিখুঁত। সর্বাঙ্গীন অর্থ এর দ্বারা প্রকাশিত হবে। এই ভাবে অনুবাদ যে দুরূহ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। নিখুঁত প্রতিলিপি বোধহয় একমাত্র বিজ্ঞান প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে পদার্থ বিজ্ঞানের 'ইনটারফিয়ারেন্স' কথাটি। এর অর্থ একটিই—তার বেশী নয়। সুতরাং পরিভাষাও একটিই হবে—একাধিক নয়। ভগবদ্গীতার নাকি একশো ত্রিশটি বিভিন্ন ইংরাজী অনুবাদ আছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক লেখাই কখনো একবারের বেশী দুবার অনূদিত হয় না, কারণ তার ব্যাখ্যা মাত্র একটি।

নানা কারণে বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদ মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে চিন্তার বিনিময় আজকাল অত্যাবশ্যক এবং উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে আরও অধিক। নিজস্ব ক্ষেত্রে অথবা সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলিতে নতুন কি জ্ঞান সংযোজিত হল জানতে হলে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে অন্য ভাষার শরণাপন্ন হতেই হবে। যদিও আমাদের জ্ঞানীসমাজে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয় কিন্তু ইংরাজি, জার্মান, রাশিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষা না জানা তাঁর নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণের প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত। একজন সমসাময়িক জাপানী কবির রচনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে না পৌঁছলে হয়ত ততটা ক্ষতি হবেনা যতটা হবে আজ জাপানীরা 'ফাস্ট ব্রিডার

রিয়্যাকটর' জাতীয় পরমাণু প্রয়োগ কৌশলে নতুন কি উপায় উদ্ভাবন করেছেন সেটা অবিলম্বে জানতে না পারলে, আমরা নিজেরা যখন রিয়্যাকটর নির্মাণকাজে হাত দিয়েছি এবং যখন আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তি উৎপাদন ও গবেষণার পক্ষে তার গুরুত্ব অপরিসীম তখন এ বিষয়ে সবরকম ব্যবহৃত পদ্ধতি না জেনে আমাদের পক্ষে সহজতম এবং সুলভতম পন্থা খুঁজে বার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বলাই বাহুল্য এই সব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছুবার একমাত্র উপায় দ্রুত ও সুষ্ঠু অনুবাদ। অন্যথায় আমাদের যে কোন উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প অনেক বেশী—ব্যয়সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

বৈজ্ঞানিক রচনাকে মোটামুটি ভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—

(১) স্নাতকোত্তর, গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়

(২) কলেজ পর্যায়

(৩) স্কুল পর্যায়

(৪) লোকপ্রিয় বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক রচনার পাঠক নানা শ্রেণীর। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র, জীবিকার দিক দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন জনসাধারণ যাঁরা কেবল কৌতূহল নিবারণের জন্য বিজ্ঞান পড়তে চান, অথবা বিশেষজ্ঞ যিনি সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করেন এবং অপরাপর ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ইত্যাদি নানাবিধ পাঠকের কথা অনুবাদের সময় মনে রাখা প্রয়োজন। তবে একটা বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই সেটা হল সর্বসম্মত ও স্বীকৃত পরিভাষার ব্যবহার।

এখন স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা পর্যায়ে যাবতীয় কাজকর্ম ইংরাজীতেই সম্পাদিত হয়। অন্যান্য ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ নিয়ে বিশেষ কোন সমস্যা নেই—তা বহুদিন ধরে হয়ে আসছে এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারী সংস্থাও আছে। পরমাণু শক্তি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিজেদের অনুবাদক থাকে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এরকম সম্মেলন ভারতে যদিও হয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত ভাষা সব সময়েই বিদেশী। আঞ্চলিক ভাষায় এযাবৎ হয় নি।

কলেজ পর্যায়ে ইংরাজীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ক্রমাগত দাবী আসছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এই দাবী মেনেছেন, কেউ বা মানতে প্রস্তুত নন। কারণ হিসাবে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব। স্কুল পর্যায়ে অবশ্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছে এবং পাঠ্যবইও পাওয়া যায়।

অনুবাদের আসল প্রশ্ন হল মূল ভাষা থেকে গ্রাহক ভাষার একটি ভাবের স্থানান্তর করণ। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন গ্রাহক ভাষা সেই ভাবকে ধারণ করার উপযুক্ত

অর্থাৎ তার শব্দ সম্ভার এবং শক্তি এমন যে অনায়াসে তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। ভারতীয় কোন ভাষাই এখনো সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম কিনা এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তার অবশ্য একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় ভারতের মাটিতে ছিল না, তাকে বিদেশ থেকে রোপণ করা হয়েছিল। এদেশে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা ও বিস্তার হল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হলেও আপাততঃ আমরা আমাদের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুবাদের সমস্যা এই দিকেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বিজ্ঞানের বিলম্বিত বিকাশের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশে। এই শতাব্দীর, এবং ভাল করে বলতে গেলে গত কয়েক দশকের দ্রুত বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে আমাদের ভাষাগুলি তাল রাখতে পারে নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই সত্য গোড়াতে স্বীকার করে নেওয়া ভাল, কারণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হলে এদিকে যা করণীয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়বে না। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইত্যাদি কথা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। আমরা যখন ভাষা নিয়ে গর্ব করি তখন বোধ হয় ভুলেই যাই যে কেবল গল্প উপন্যাস কবিতা দিয়ে কোন ভাষার সর্বাঙ্গীন পুষ্টি সম্ভব নয়—প্রবন্ধের ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দাবলীও ভাষার শরীর গঠনে কম সহায়ক নয়। এই দিকে এখন মোহমুক্ত দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যে বিরাট কর্ম কাণ্ডের আয়োজন চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরো প্রসারিত হবে তাতে কোন না কোনভাবে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ জড়িত হচ্ছেন। এই জনসমষ্টি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বা সমাজের উপরের স্তরের লোক নন—এঁদের মধ্যে সর্বস্তরের লোক আছেন যাঁদের কাছে এটি জীবিকার প্রশ্ন—এঁদের অনেকের কাছেই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার অর্থ সময়ের অপচয়—সেইজন্যই আজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অনুবাদের প্রসঙ্গ এত জরুরী।

অনুবাদের কাজে সর্বপ্রধান সমস্যা হল পরিভাষা—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সর্বসম্মত পরিভাষার অভাবে ইচ্ছামত শব্দ তৈরী করা হয়ে আসছে যেমন রবীন্দ্রনাথ ইনফ্রা রেড্ ও আলট্রা ভায়োলেটকে বাংলায় লিখেছিলেন লাল উজানী ও বেগনী পারের আলো। কথা দুটি বাংলায় বিশেষ চলেনি। পরিবর্তে যা বহুল ব্যবহার হয়ে আসছে তা হল অবলোহিত ও অতিবেগুনী। সেইরকম পজিটিভ ও নেগেটিভকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন হাঁ- ধর্মী ও না—ধর্মী। এক নিউক্লিয়াস কথাটির বাংলায় নানাবিধ রূপ দেখা যায়, যথা অণু, পরমাণু, কেন্দ্র ও নাভি। পরিশিষ্টের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে এই সমস্যাটা স্পষ্ট হবে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাংলায় যাকে অণু বলা হয় তা হল মলিকিউল এবং পরমাণু হল অ্যাটম—এটাই সর্ববাদীসম্মত পরিভাষা। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও যে অণু পরমাণুতে গোলমাল করে ফেলেন সেটা খুবই দুঃখজনক।

১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তবে বইটি এখন সহজলভ্য নয়।

বাংলায় অনুবাদ করার সময় উপযুক্ত বাংলা অভিধানের অভাবে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। কোন বাংলা অভিধানেই পারিভাষিক শব্দ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো নেই। এমনকি বর্তমানে যে সব পারিভাষিক শব্দ চালু আছে শুধু সেগুলি সংগ্রহ করে কেউ যদি বাংলায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে একটি সঙ্কলন করেন তা হলেও অনুবাদক এবং সাধারণভাবে সমস্ত কৌতূহলী পাঠকই উপকৃত হন। অনেকে স্বীকার করবেন যে বহুল প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি, যেগুলির উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলায় নেই সেগুলির বদলে কোন নতুন অপ্রচলিত শব্দ সৃষ্টি না করে সেই বিদেশী শব্দটিকে আত্মসাৎ করা অনেক দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয়। আধুনিক হিব্রু ভাষা এই উপায়ে ক্রমাগত তার শব্দসম্ভার বাড়িয়ে চলেছে। কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া। অর্থাৎ কেবল অ্যাটম শব্দটিই ইংরাজী থেকে নেওয়া হবে না অ্যাটমিক, অ্যাটমাইন প্রভৃতিও চলবে। না বাংলায় অ্যাটমীয়, অ্যাটমীকরণ প্রভৃতি চলবে। সুতরাং শব্দের বিভিন্ন রূপগুলি সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার।

ভাষা বহতা নদীর মত। তার স্রোত কখনই থেমে থাকে না। গতিই জীবনের দ্যোতক। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে ভাষা তার নিজস্ব প্রয়োজনে পথ সৃষ্টি করে নেবে। কিন্তু এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে এই স্রোতস্বতীকে হয়ত অধিকতর কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করা যাবে।

পরিশিষ্ট

(১)

কালমান যন্ত্রের ধ্রুবত্বের বিষয়েও তাঁহারা একই প্রকারে নিঃসন্দিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ও প্রিন্সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপভূমি সকলের পক্ষে একই এবং তাহার ধর্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত গণিত শাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুইশত বৎসর সর্বগ্রাহ্য ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত্যসামঞ্জস্য আছে কি না তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্মমানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার মধ্যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়িতে লাগিল, তাহার নিরাকরণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হইল না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

—বিজ্ঞানের সংকট

(২)

অশ্বখুর তড়িচ্চুম্বক—ইহাতে কাঁচা লোহার বা কোন উচ্চ চৌম্বকীয় সংবেদন-প্রবণতা এবং নিম্নতম চৌম্বকীয় গতিশীলতা গুণবিশিষ্ট একটি নমুনা রডকে অশ্বখুরের আকারে বেঁকাইয়া লওয়া হয় এবং উহার দুই বাহুর উপর অন্তরিত তার যথোপযুক্ত ভাবে জড়াইয়া একটি অখণ্ড সলিনয়েড গঠন করা হয়। এক বাহুর উপর তার জড়ানো শেষ হইলে উহার মাথা ঐ বাহুর উপরের পৃষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্য বাহুর তলা দিয়া ঢুকিবে এবং দুই বাহুতে তার জড়ানোর পর তারের শেষ প্রান্ত বাহুর তলা দিয়া গিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই যে, কোন সমপ্রবাহী তড়িৎপ্রবাহ এই অখণ্ড সলিনয়েডটির তারের মধ্য দিয়া চালনা করা হইলে, প্রান্তীয় দিক্ হইতে দেখিলে সলিনয়েডের যে প্রান্তে তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে বহে, নমুনাদণ্ডের ঐ প্রান্তে একটি চৌম্বকীয় দক্ষিণ মেরু এবং অন্য প্রান্তে চৌম্বকীয় উত্তর মেরু গঠিত হয়। তার জড়ানোর পদ্ধতিটি এই ক্ষেত্রে তাই একটি বিশেষ বিষয় রূপে গণ্য হয়।

—পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্কুলপাঠ্য বই

(৩)

কির্ণফ সূর্যের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে ঃ—সূর্যদেহের অভ্যন্তর একটি ঘনীভূত পিণ্ড—(Photosphere) আর উহার চারিদিকে একটি পাতলা বাষ্পের আবরণ (Chromosphere) আছে। এই আলোকমণ্ডল (Photosphere) ও বর্ণমণ্ডলের (Chromosphere) বর্ণচ্ছত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় কি না? উত্তরে বলা যায় যে, যদি আলোকমণ্ডলটি কোনওরূপে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে আমরা শুধু বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপার সহজসাধ্য নয়। আমরা একটি গোল চাকতী নির্মাণ করিয়া উহাকে এমনভাবে দূরবীক্ষণের সামনে স্থাপন করিতে পারি যে, আলোকমণ্ডল সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ সূর্য আকাশের যে অংশ অধিকার করিয়া আছে, শুধু যে সেই অংশ হইতেই সূর্যালোক পাওয়া যায় এমন নহে।

মেঘনাদ সাহা

—নরওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল

শ্রীসুকুমার সেন

রবীন্দ্রনাথ জীবনের কবি, আনন্দের কবি। নিজেই তিনি স্পষ্ট কথায় স্বীকার করে গেছেন, 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। এ আনন্দ জীবনের আনন্দ, প্রাণের সরব নীরব অনুভূতির আনন্দ। চল্লিশ বছর বয়সে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, 'মরার পরে চাইনে ওরে অমর হতে'। কিন্তু মৃত্যু তো বৃহত্তর জীবনের তোরণদ্বার। মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি, তবে মরণের পরে কোন স্বর্গলোক বা অমৃতধামও স্বীকার করেন নি। (ব্রহ্ম সঙ্গীতের কথা এখানে ভুলে যাব।) পঞ্চাশ বছরের পর থেকে মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু মর্ত্যধরার আলোছায়ার আলিঙ্গনে, হাওয়ার দোলায়, বকুলের সৌরভে, প্রাণের বিচিত্র প্রকাশে তাঁর মন ভরে রয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন তাঁর যে প্রাণ তা নিসর্গের সঙ্গে বৃহৎ প্রাণের সঙ্গে একতালে স্পন্দিত হচ্ছে। এ ব্রহ্মবাদ নয়, একে বলা যায় অভিনব মায়াবাদ। সহজ করে বলতে গেলে বলব লীলাবাদ। (অভিনব বলছি এই কারণে যে বৈদান্তিক মায়াবাদে জগৎ মরীচিকার মতো মিথ্যা, মায়া ব্রহ্মের যবনিকা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় জগৎ সত্য—সে যদি মায়া হয় তো তা ব্রহ্মেরই রূপ)। শিশুলীলায় যা কান্না হাসির দোলা তারই প্রকারভেদ বর্ষীয়ানের ভাবনায় জীবন-মৃত্যুর পালা-বদল। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' তখনও তাঁর সত্তা যে বৃহৎসত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্য প্রাণের প্রকাশে মর্ত্যধরার খেলার রস এইমতই উপভোগ করবেন—এ ভাবনা তাঁর বাহান্ন বছর বয়সেই উদিত হয়েছিল। জীবনের অখণ্ড স্রোতে যেন গা ভাসিয়েই রবীন্দ্রনাথ অনুভব এবং কল্পনা করেছিলেন,

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
করবে খেলা সকল খেলায় এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

এই গান এবং আরও কয়েকটি গান থেকে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনা সমগ্রভাবে বিচার করলে সে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তায় মিশে গেলে তার পরে কী যে হয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্বাক।

ভবিষ্যতের আশ্বাস সত্ত্বেও গানটিতে ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ প্রকট হয়েছে ধুয়া পদে

তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা ভোগের ভালোবাসা নয়, সুখের ভালোবাসা নয়, ভোগ ত্যাগ সমান দৃষ্টিতে নিয়ে সুখ-দুঃখের তালে

তালে সমান ভাবে পা ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার আনন্দ। সে আনন্দ কোন প্রাপ্তিতে নয়, বিশুদ্ধ অনুভবে। এই অনুভব যদি ব্রহ্মানন্দ হয় তবে সে আনন্দ মানুষ-জীবনেই লভ্য, অন্য কোনও অধ্যাত্মলোকের অস্তিত্বে নয়। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা'—বৈষ্ণব কবির এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্পষ্টতর এবং আরও ব্যাপক হয়েছে। বিশ্বপ্রাণের আনন্দ প্রকাশ যে—আনন্দলোকে তা কবির চোখে কীভাবে ধরা পড়েছিল তা একটি গানে অত্যন্ত সহজে ব্যক্ত হয়েছে।

গানটি এই :

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে॥
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
    বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তায় আলো প্রাণপ্রবাহের, আনন্দধারার, সিঞ্চন। হয়ত এই চিন্তার বীজ পেয়েছিলেন তিনি বাল্যকালে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে।

জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে সে ভোজ্যে তিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়েও পরিতৃপ্তি লাভ করেন নি, কেন না সে আনন্দের পরিতৃপ্তি নেই, সেই আনন্দের অনুভবই জীবনরস-পান। এবং সে আনন্দযজ্ঞে তিনি ভোক্তাই ছিলেন না, ভোজ্যের আয়োজনেও তিনি সূপকার ছিলেন। তাঁর আয়োজিত ভোজ্য মর্ত্যলোকে আমাদের আনন্দযজ্ঞের জন্য ধরা রয়েছে। সে অতি সহজলভ্য, আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে—যদি চোখে পড়ে, মনে লাগে। এই ভাবনার সহজ প্রকাশ রয়েছে একটি পরিচিত গানে।

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে   হাটের পথিক চলে ধেয়ে,

ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই-যে দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥
আমার এযে বাঁশের বাঁশী, মাঠের সুরে আমার সাধন।
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু'চোখ পুরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে॥
দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজনে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি, ভাই, কাছের সুধা নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা—
এই-যে এ-সব ছোটো খাটো পাই নি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা॥
লাগলো ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, সজল আঁখি— মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো।
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো॥

এই গানটির মর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে পারি যে সহজসিদ্ধি বলে যে কথা আমাদের পড়া আছে এবং যে শব্দের খাঁটি অর্থ আমাদের ঠিক জানা নেই, সেই সহজসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। মাঠের সুরের সাধনায় তিনি সহজসিদ্ধ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রঙে-রসে যে আনন্দের ডালি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন, তার মধ্যে তিনি নিজের মনটিকেও যথা সম্ভব পুরে দিয়ে গেছেন। আমাদের মনে যে তাঁর মনের স্পর্শ হয়ত কিছু কিছু লাগবে চিরকাল না হোক অন্ততঃ দীর্ঘকাল ধরে সে করুণ আশা তাঁর মনের কোণে ছিল। গান ও কবিতার মধ্যে তার ইঙ্গিত বারবার পাওয়া যায়।

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি।
তবু তো ফাল্গুন রাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলছল, এই বহু মানি॥

স্মৃতিরক্ষার সমারোহে তাঁর যে বিদ্বেষ ছিল তার স্পষ্ট আভাস রয়েছে পরিশেষের 'দিনাবসান' কবিতাটিতে। কবিতাটি পড়লে কোনো রবীন্দ্র স্মৃতি সভায় যেতে মন সরে না।

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,

এই জনমের লীলার পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ ॥

... ...

আমার স্মৃতি থাকনা গাঁথা
আমার গীতিমাঝে,
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।
যেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি ॥

তাঁর স্মৃতি জেগে উঠবে প্রকৃতির পরিবেশে। তাঁর স্মৃতি ভেসে উঠবে তাঁর গানে, তাঁর স্মৃতি হয়ত আরও কিছুকাল টিকে থাকবে তাঁর শান্তিনিকেতনে যেখানে তিনি দিনের বেলায় কাজের খেলা খেলতেন, রাত্রিবেলায় 'নানা রঙের স্বপন দিয়ে রূপের ডালি' ভরতেন।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাদী পরিবেশে। তাঁর প্রথম জীবনে ব্রহ্মবাদ তাঁর বাহ্য ধর্ম ছিল বলতে পারি। তখনও তাঁর নিজস্ব ধর্ম খুঁজে পাবার সময় হয়নি।

এই ব্রহ্মবাদের সাধনায় একটা মূল আস্থা ছিল ত্যাগে ও বৈরাগ্যে অর্থাৎ ভোগ নিঃস্পৃহতায়। একে নিষ্কামতা বলব না নিঃস্পৃহতাও নয়, এ হল মনের সংযম। ত্যাগের মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মন সর্বদা টানত। কিন্তু বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস তা তিনি মানেননি। পঞ্চাশ বছরে পড়বার আগেই তিনি লিখেছিলেন—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। তাহলে কোন্ সাধনে কোন্ পথে তিনি মুক্তির দিশা পেয়েছিলেন? এর উত্তর পাওয়া যায় তৃতীয়বার বিলেতে যাবার অব্যবহিত পূর্বে লেখা একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত রচনায়।—একটি গানে।

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহিরে॥
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পদতলে পড়িব লুটে
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে॥
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে॥
যে বাঁশীখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধুপবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহিরে॥

গানটির ধ্রুবপদে কবি বলতে চেয়েছেন, আমি ধ্যাননিবিষ্ট যোগী বা কায়কল্প সাধক নই, আমি পরিব্রাজক, চলাই আমার ধর্ম। তারপর তিনটি স্তবকে তিনটি ছবি দিয়ে তাঁর ধর্ম যে কী তা বিশদ করেছেন। প্রথম ছবিতে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইছেন যে পরম তত্ত্ব বা চরম সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করতে স্বতঃই অপারক। ধ্যানের ধনকে নিজের হৃদয়ে ধরে রাখতে পারেন না। জগৎসংসারে বিশ্বপ্রাণের যে রথযাত্রা চলেছে সেই রথযাত্রার তিনি ভক্ত দর্শনার্থী। দ্বিতীয় ছবি থেকে বুঝি যে, সমাধিমগ্ন যোগীর অচঞ্চল হৃদয়ে যেমন পরম সত্য, চরম তত্ত্ব, কমলরূপে ফুটে ওঠে তেমন তাঁর নয়। তাঁর মুগ্ধ চিত্ত বিশ্বপ্রাণের রথের চক্রচিহ্ন ধরে ধাবমান। স্থিরজল সরোবরে পদ্ম ফোটে, চঞ্চলস্রোত নদীতে পদ্ম ফোটে না। অচঞ্চল চিত্ত যোগীর, স্থির চিত্ত কমলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তাঁর চঞ্চল চিত্ত যেন স্রোতের জল, তাতে ব্রহ্ম-অধিষ্ঠিত কমলের স্পষ্ট ছবি পড়ে না, শুধু ভাঙা ভাঙা ছায়া পড়ে। সেই ছায়াটুকু নিয়েই তাঁর হৃদয় যেন গানের তরী বেয়ে চলেছে

জীবন-স্রোতে, সব কিছু দেখতে দেখতে। তৃতীয় ছবির বক্তব্য, তাঁর ধ্যানের ধন, ব্রহ্ম বা বিশ্বপ্রাণ, স্রোতও বটে, স্রোতের উৎসও বটে। গানের তরী বেয়ে যেতে যেতে সেই উৎসের কলধ্বনি হয়ত একদিন শোনা যাবে। তখন তিনি সেই কলধ্বনি তাঁর গানের সুরে ভরে দিয়ে গেয়ে গেয়ে বেড়াবেন চরম মুহূর্তের প্রত্যাশায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-আকুতির প্রকাশ যে তাঁর গানে সেকথা অনেক আগেই বলেছেন তিনি। আবার স্মরণ করুন গীতাঞ্জলির 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' গানখানি।

নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তায় মুক্তির স্বরূপ কী?

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অনন্তবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর মুক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়া॥

এতো হল জীবন থেকে মুক্তি এতো চরমমুক্তি নয়। চরম মুক্তি হল বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন মুক্তি, মোহমুক্তি। তাঁর চিন্তায় যে চরম মুক্তি কীরকম ছিল তার কিছু নির্দেশ রয়েছে পরবর্তী কালের একটি গানে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহ মনের সুদূর পারে, হারিয়ে ফেলি আপনারে
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে॥

রবীন্দ্রনাথ যে জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না, এই অন্তরঙ্গ গানটি তার এক বড় প্রমাণ। এই গানটির যে অর্থ আমি বুঝি তা হল মৃত্যুর চরম মুহূর্তে আনন্দের বিস্ফুরণে বিশ্বপ্রাণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া। যে প্রাণ তাঁর মর্ত্যকায়ায় অধিষ্ঠিত ছিল, মৃত্যুর পরে তা আকাশে আলোয় আলোয় বিচ্ছুরিত হবে, ধুলায় ধুলায় বিকীর্ণ হবে, ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চিত হবে। এই হল দৃশ্যভুবনের কথা। অদৃশ্য ভুবনে তা অনির্বচনীয় রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হবে, সকল মানুষের মনে ঝংকার তুলবে, সকল কঠিন কাজে, মহৎ ত্যাগে উদ্দীপনা যোগাবে। এই ভাবে তাঁর মুক্তি মানে সর্বব্যাপী অস্তিত্বে জন্মলাভ।

নিজের অধ্যাত্ম-ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে কবিতায় গানে নানাভাবে বার বার বলেছেন। আমি এই আলোচনায় শুধু তার গানকেই ধরেছি। কেন, তা বলে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রবন্ধে, শান্তিনিকেতনের ভাষণে, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা উপস্থিত ব্যক্তিদের, সমসাময়িকদের বোঝাবার জন্যে। কবিতায় যা প্রকাশ করেছেন তা বর্তমান ও অনাগত বৃহত্তর পাঠকদের জন্যে। গানে যা গেয়েছেন তার অধিকাংশই নিজের জন্যে। তাই গানে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ অকুণ্ঠিত এবং নির্বাধ, কোন রকম তত্ত্বকথার সংশ্লেষবর্জিত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর তার গানেই অবারিত হয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। (২৬।১।৮০ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ)।

আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মীলেখযুক্ত শৈবমূর্ত্তি

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার

গত বৎসর ১৮ই মে, আমি পাটনা যাদুঘরের অধ্যক্ষ ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত-মহাশয়ের একখানি চিঠি পাই। চিঠির সঙ্গে তিনি কোন প্রস্তর মূর্ত্তির লেখসমন্বিত পাদপীঠের একখানি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। ডক্টর গুপ্ত জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি জাপান পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন; সেখানে ক্যোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক তাহাকে ঐ মূর্ত্তিলেখটির পাঠোদ্ধারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। গুপ্তমহাশয় আরও জানান যে, কিছু কাল পূর্ব্বে জাপানী পুরাতাত্ত্বিকগণের একটি দল আফগানিস্থানে ঐ মূর্ত্তিটি আবিষ্কার করিয়াছিল। আমি তখনই তাঁহাকে জানাইলাম যে, লেখটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ আছে।

কিছুদিন পর আমি আফগানিস্থানের ঐ মূর্ত্তিলেখটি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি এবং উহা ২১।৮।৭২ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত উচ্চগবেষণা কেন্দ্রের মাসিক আলোচনাচক্রের অধিবেশনে পঠিত হয়। উহার কয়েক মাস পরে ডক্টর গুপ্ত মূর্ত্তিটির সম্পর্কে আমাকে আরও কিছু বিবরণ দেন। তিনি ক্যোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের যে অধ্যাপকের নিকট ফোটোগ্রাফটি পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম তাকায়াসু হিগুচি। তাঁহারই নেতৃত্বে জাপানীরা কাবুলের কিছুটা উত্তর দিকে অবস্থিত তাপাস্কান্দার নামক স্থানের টীলাতে খননকার্য্য চালাইয়া শিলামূর্ত্তিটি আবিষ্কার করে। স্কন্দের সহিত উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি মার্বেল প্রস্তরে ক্ষোদিত। প্রস্তর খণ্ডটি ৮১.৫ সেন্টিমিটার উচ্চ; উহা প্রস্থে ৪২ সেন্টিমিটার এবং বেধ বা গভীরতায় ১৮ সেন্টিমিটার। উহা খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়; কিন্তু খণ্ডগুলিকে জুড়িয়া মোটামুটি সম্পূর্ণাঙ্গ করা গিয়াছে। মহেশ্বর বৃষের পৃষ্ঠে কিছুটা দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া সমাসীন। তাঁহার দক্ষিণ পদ নিম্নদিকে লম্বিত, বাম পদ বৃষের পৃষ্ঠে শায়িত। তাঁহার চারিহস্ত। বামদিকের নিম্নহস্ত উমার স্কন্ধে ন্যস্ত; বাম উর্দ্ধহস্তে ত্রিশূল, উহা উমার মাথার উপর দিকে দেখা যায়। দক্ষিণের উর্দ্ধহস্ত ভগ্ন; বামহস্ত জানুর উপর স্থাপিত। মহেশ্বরের বামদিকে উমা তাঁহার দিকে হেলিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহার নিকটে বামদিকে বালক স্কন্দ। মূর্ত্তিটির স্থানে স্থানে লাল, নীল এবং কৃষ্ণবর্ণের ব্যবহার দেখা যায়।

ডক্টর গুপ্ত আমাকে আরও জানাইলেন যে, ইতিমধ্যে জাপানী পণ্ডিত মেইজি য়ামাদা লেখটির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠ Archaeological Survey of Kyoto University in Afghanistan, 1970, সংজ্ঞক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাকে জাপানীপণ্ডিত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মূর্ত্তি লেখটির পাঠও পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম যে, উহাতে অসংখ্য ভুল এবং উহার কোন অর্থকরাও সম্ভব নহে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি আফগানিস্থানে আবিষ্কৃত একটি গণেশ মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ লেখের পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা কাবুলের দক্ষিণে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত গার্দেজ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে মূর্ত্তিটি কাবুলে পামির সিনেমার নিকটবর্ত্তী পীর রতননাথের দরগায় পূজা পাইতেছেন। এই মূর্ত্তির লেখটি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। স্কান্দারের শৈবমূর্ত্তির লেখটিও উহার অনুরূপ। দুইটি লেখেরই অক্ষর অতি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত; কিন্তু বর্ত্তমান লেখটিতে অক্ষরের গঠনে ত্রুটি আছে।

স্কান্দারের মূর্ত্তিলেখে মাত্র তিনটি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহাতে অনুস্টুভ ছন্দে রচিত দুইটি শ্লোক দেখা যায়। শ্লোকদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি গদ্য বাক্য রহিয়াছে। অক্ষর গঠনের ত্রুটির জন্য দ্বিতীয় শ্লোকটির পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ দুরূহ।

আমি লেখটির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা নিম্নরূপ।—

১। একমূর্ত্তিস্ত্রিধা জাতা ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ম্মহেশ্বরঃ (।*)
কর্ত্তা বি-

২। ষ্ণুঃ ক্রিয়া ব্রহ্মা কারণন্তু মহেশ্বরঃ ॥
উক্তঞ্চ ভগবতা মহাদেবেন (।*)
যথাগ্নির্মাভিপ্রক্ষিপ্য বিশোধনোপলক্ষণম্।

৩। কৃত্বাহং চৈব বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ নিরয়ং গতাঃ ॥

প্রথম শ্লোকটির অর্থ বোধে অসুবিধা নাই। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু কর্ত্তা, ব্রহ্মা ক্রিয়া এবং মহেশ্বর কারণ। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা এবং শিব অর্থাৎ মহেশ্বরকে সংহারকর্ত্তা বলা হয়। কিন্তু এখানে মনে হয়, ব্রহ্মাকে সৃষ্টি এবং বিষ্ণুকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিবকে সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে। উহার পর ভগবান্ মহাদেব অর্থাৎ শিবের উক্তি বলিয়া দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একবার আত্মশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আপনাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিন জনকেই নরকে যাইতে হইয়াছিল। শ্লোকটি কোন পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

জাপানী পণ্ডিত মেইজি য়ামাদা লেখটির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

১। একমূর্ত্তি ত্রিবাসনা ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ম্মহেশ্বরঃ
কর্ত্তা বি-

২। ষ্ণুঃ ক্রিয়া ব্রহ্মা কারণ তু মহেশ্বরঃ
উক্ত চ ভগবতা মহাদেবেন
য (দ, দ্ব) পিমতিম্ম্ দি স্য বি (ৎ স, স্ত) রং নে (নো, তেনো) পলভ্যাতে (বা, ধা)

৩। ত (ত্ব) হং দৈব বিষ্ণুষ্য ব্রহ্মা চ নিলয়ং গতা

এই পাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি অনেক। প্রধান ভুলের মধ্যে প্রথমপংক্তিতে 'ত্রিবাসনা' অর্থহীন। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের কোন অর্থবোধ সম্ভব নহে। উহার দ্বিতীয়ার্ধে 'দৈব', 'বিষ্ণুস্য', এবং 'নিলয়ং', অর্থহীন ভ্রান্তপাঠ।

আমি যখন লেখটির পাঠোদ্ধার করি, তখন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ত্রিমূর্ত্তি সংবলিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, ঐ ফলকে উমা ও স্কন্দের সহিত মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্ত্তি নহে। যাহা হউক, যিনি ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, তিনি অবশ্যই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং শিব, উমা, স্কন্দ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তবে শিবকে তিনি অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন বলিয়া বোধ হয়।

পরিষৎ সংবাদ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

গত ১৮ চৈত্র, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ১ এপ্রিল, '৭৩) রবিবার, অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতকুমারের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রভাতকুমার ছিলেন বাংলা গল্প-সাহিত্যের সার্থক রূপকার। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নিষ্ণাত প্রভাতকুমার বাংলা গল্প-সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। প্রভাতকুমার জীবনের সহজ-সরল-দিকগুলি লইয়া যে সব অনবদ্য গল্প রচনা করেন তা একালের গল্পরসিকদেরও চরিতার্থ করে। তিনি তাঁহার গল্পগুলিতে তত্ত্ব বা জীবনদর্শনের অবতারণা করেননি সত্য—কিন্তু হাস্য-কৌতুক-বিষাদ প্রেম-স্নেহ-ভালবাসায় তাঁহার গল্প সমূহ অনাবিল আনন্দের নির্ঝর হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় দুঃখের সঙ্গে বলেন একালের গল্পরসিক পাঠক সমাজ প্রভাতকুমারের গল্পসাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নহেন। প্রসঙ্গতঃ ডক্টর চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের জীবনের কয়েকটি অজ্ঞাত তথ্যের বিবরণ বিবৃত করেন। লণ্ডনে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে প্রভাতকুমারের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়—মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি তাহা পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকটিও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রভাতকুমারকে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সহকারী সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে পরিষদ্ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালায় প্রভাতকুমারের একটি জীবনচরিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনাদির পুনঃপ্রকাশ এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার রচনাদির সুলভ সংস্করণের গ্রন্থ প্রচারের প্রতি ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রভাতকুমার বাংলা সাহিত্যের নবযুগের যে অধ্যায়ে আবির্ভূত হন—বিশ্বসাহিত্য সভায়—পেরিক্লিসীয় এথেন্স ও এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য এই যুগের সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনীয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

প্রভাতকুমারের এই জন্ম-শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায় শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য "প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী মনোজ্ঞ নিবন্ধ পাঠ করেন। প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও কবি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রভাতকুমারের উপর লিখিত আর একটি চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য পরিষদের পক্ষে সভাপতি মহাশয়—বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত সুধী ও সজ্জনবৃন্দের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮০ (৯ মে, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১১২তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পরিষদ আয়োজিত জনসমাকীর্ণ এই সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এবারের রবীন্দ্র জন্মোৎসবকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে পরিষদের অন্যতম ন্যাস-রক্ষক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র জন্মতিথির পূর্বাহ্ণেই অসুস্থ হইয়া নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হন। সভারম্ভের পূর্বেই পরিষদ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্তা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক পীড়িত হওয়ার সংবাদ এবং তজ্জনিত অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীঠাকুরের সত্বর আরোগ্য কামনা করেন।

বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত 'হে নূতন দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভ ক্ষণ' সঙ্গীতখানির মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সভার সূচনা হয়। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ছিল এই সভার অন্যতম আকর্ষণ।

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে 'বিশ্বকবি' শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গভাষা অপূর্ব গৌরব ও মহিমা লাভ করিয়াছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কবিগুরুর সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ যোগাযোগের কাহিনী বিবৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভকে তিনি তাঁহার জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া অভিহিত করেন।

সভায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শ্রীসুকুমার সেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত এই নিবন্ধে ডক্টর সেন রবীন্দ্র জীবনদর্শনের বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) আর একটি স্বরচিত নিবন্ধ পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞভাষণ প্রদান করেন। বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর সমাপ্তি সঙ্গীতের পর ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্কিম জন্মোৎসব

গত ১৬ আষাঢ় ১৩৮০, রবিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৫তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ইতিহাসাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। জনসমাকীর্ণ এই সভা প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়। বেশ কয়েকবৎসর বিরতির পর পরিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপস্থিত সুধী ও সজ্জন বৃন্দের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্যপৌরাণিকতা" শীর্ষক একটি মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির অভিভাষণ রূপে "যুগপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র" নামক অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। "বঙ্কিমতর্পণ" শীর্ষক স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীস্বদেশভূষণ ভূঞা। শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন what Bengal thinks to day India thinks to-morrow উক্তিটি গোখেলের। কিন্তু গোখেলের পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ঋষি বঙ্কিমের মনস্বিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক স্বদেশভূষণ ভূঞা বাংলার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক অবদানগুলির যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেন।

পরিষদ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বর্তমানযুগে বঙ্কিমসাহিত্যচর্চার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ যুগেও এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। অগ্রজপ্রতিম ইতিহাসাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পরিণত বয়সেও এই বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় পরিষদ সভাপতিরূপে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আচার্য মজুমদার ও শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত নিবন্ধ দুটি সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করিয়া পরিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব সভা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপস্থিত সকলকেই সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তিনি সাহিত্যানুরাগী সকলকেই পরিষদের উজ্জীবনে সহযোগী হইত আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

গবেষণা বৃত্তি

দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক (এটর্ণি) মহাশয় সৃষ্ট "কালিদাস মল্লিক চ্যারিটেবল্ ট্রাষ্ট" হইতে সাহিত্য পরিষদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে "আরতি মল্লিক" গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা অনুদান গ্রহণের একটি প্রস্তাব পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। গত ২৬শে বৈশাখ তারিখে কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে এই অনুদান গ্রহণের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অনুদানের জন্য দাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনও জ্ঞাপন করা হয়। ইহার পর সাধারণ মাসিক অধিবেশনে ইহাই স্থির হয় যে কালিদাস মল্লিক চ্যারিটেবল্ ট্রাষ্টের এই

মাসিক অনুদান হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য মাসিক ২৫০ টাকার দুইটি বৃত্তি দুইজন গবেষককে দেওয়া হইবে।

এই সঙ্গে রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি নামে মাসিক ১৫০ টাকার আরও একটি অনুরূপ বৃত্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গত রামকমল সিংহের স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট রামকমল স্মৃতিরক্ষা তহবিলের জন্য সংগৃহীত ২৫,০০০·০০ টাকার স্থায়ী আমানতের সুদ হইতে এই গবেষণা বৃত্তির ব্যয় নির্বাহ হইবে ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

"আরতি মল্লিক" ও "রামকমল সিংহ" গবেষণা বৃত্তির জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছে। কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ সমিতিকে উপযুক্ত প্রার্থী তথা গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

পরিষৎ সেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমদান

বাঙলার মহাপুরুষদের স্পর্শপূত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাভাবে সংস্কার করা হয় নাই। দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্র চিত্র সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানের ও উপকরণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কার্যে সহায়তার জন্য বাঙলার ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্যে ছাত্রস্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষ সংস্কারের কার্যে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়া শ্রমদান করেন। ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রথম দিন সাত টাকা রোজে একজন রাজমিস্ত্রী এবং চারি টাকা রোজে একজন মজুর নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় দিন স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিষদের দৈনিক এই এগার টাকা ব্যয় বন্ধ করিবার জন্য রাজমিস্ত্রী ও মজুরকে বিদায় দেন এবং নিজেরা বাঁশের ভারা বাঁধিয়া, দেওয়াল মাজিয়া ঘষিয়া, যাবতীয় উপকরণ বহন করিয়া চুণকাম ও রঙের যাবতীয় কাজ করেন। হলঘরের পুরাতন ছবিগুলিকে নামাইয়া সযত্নে পরিষ্কার করিয়া, প্রত্যেক ছবির পিছনে বাদামী কাগজ লাগাইয়া, নূতন রিং ও তার দিয়া বাঁধিয়া টাঙাইয়া দেন। পরিষদমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মনীষী ও মহাপুরুষদের শ্বেতপ্রস্তরের বেদী ও মর্মরমূর্তিগুলি মালিন্যমুক্ত করিয়া শোভন ও সুন্দরও করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার ২৬ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের এই কাজের বিবরণ ও চিত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দির সংস্কার ব্যতীত ইঁহারা পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ পঞ্জীয়ন কার্যেও সহায়তা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবগঠিত ন্যাসরক্ষক সমিতি

গত ১৭ই মাঘ, ১৩৭৯ পরিষদের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিষদের নূতন ন্যাস রক্ষক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১) ডঃ শ্রীসুকুমার সেন
(২) শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম্-পি
(৪) শ্রীঅশোককুমার সরকার
সম্পাদক— আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ
(৫) ডাঃ বিমলেন্দুনারায়ণ রায়
কোষাধ্যক্ষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (পদাধিকার বলে)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৮০, সংখ্যা—২
শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৮০

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে গৌরব ও সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি সাহিত্যিক নহি এবং এই সম্মানের যোগ্যতা বা অধিকার আমার নাই। কিন্তু কৈশোরকাল হইতেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত। সুতরাং জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে বর্তমান কালের ছাত্রদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য রচনা তো দূরের কথা উপন্যাসেরও সমাদর খুব বেশী নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রও ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। আমাদের ছাত্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর—অন্ততঃ উপন্যাসগুলির সহিত অপরিচিত ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম তখন আমাদের কয়েকজনের অবসর বিনোদনের একটি উপায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতে একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া তাহা কোন্ গ্রন্থে আছে এই প্রশ্ন করা। যতদূর মনে পড়ে এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়ায় অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিতাম। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে যেদিন অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস প্রথম পাঠ করি সে দিন যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ে ও আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়াছিল আজিও তাহা ভুলি নাই। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়াছি—একবার দুইবার পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই নাই বহুবার পাঠ করিয়াছি। ইহাতে কেবল যে রস ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, উপন্যাসের চরিত্র-গুলির আদর্শ ও ভাবধারা জীবনের চিরন্তন সম্পদরূপে পরিণত হইয়াছে। নরনারীর একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে সর্বনাশের চিত্র, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের অপূর্ব আদর্শের পার্শ্বে স্বার্থপরতার পঙ্কিলতা এরূপ পাপপূর্ণ ও ভালমন্দের কত বিচিত্র চিত্র আমার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, নর-নারীর কত অপূর্ব বিচিত্র কাহিনী ভাষা ও ভাবের মাধুর্যে ও অভিনব দৃশ্য-পটের অবতারণায় অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া মন মুগ্ধ করিয়াছে। অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে প্রকৃতি দুহিতা কপালকুণ্ডলার কণ্ঠোত্থিত মৃদু ধ্বনি "পথিক

তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" একবারমাত্র নবকুমার শুনিয়াছিলেন কিন্তু জীবনে বহুবার কর্ণে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। নিশীথে জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ অথবা ত্রিস্রোতার জলে সুসজ্জিত তরণীকক্ষে ব্রজেশ্বর ও দেবীচৌধুরাণীর মিলন—একবার পাঠ করিলে কেহ কি কখনও ভুলিতে পারে? স্বল্প কথায়, ইঙ্গিতে ও পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে মানব চরিত্রের অন্তঃস্থলের গোপনতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অপরূপ নাট্য কৌশলে একাধারে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।

সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমারের স্ত্রী দৈব বিড়ম্বনায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা মতিবিবি সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের প্রণয়িনী ছিলেন। সেলিমের পূর্ব প্রণয়িনী মেহের-উন্নিসা তখন বর্ধমানে শের আফগানের স্ত্রী। মেহেরউন্নিসার চিত্ত তখনও সেলিমের প্রতি আসক্ত কিনা ইহা জানিবার জন্য মতিবিবি বাল্য সহচরী মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, হিন্দুস্থানে মেহেরউন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত। মেহেরউন্নিসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি যে শের আফগানের বনিতা এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার দাসী ইহা তুমি ভুলিও না।" কিন্তু যেই শুনিলেন যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছেন, অমনি মেহেরউন্নিসার নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?" অসংযত মুহূর্তে উচ্চারিত এই একটি কথায় মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের গোপন রহস্য ও চরিত্রের কি আশ্চর্য অভিব্যক্তি হইয়াছে! মতিবিবি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুতেই জানিতে পারিতেন না এই একটি স্বগতোক্তি হইতেই তাহা নিশ্চিত বুঝিলেন।

কিন্তু এই আশাভঙ্গের নৈরাশ্য যে মতিবিবিকে কেন বিচলিত করে নাই—তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ধমান যাইবার পথে মতিবিবি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন—এবং দৈবক্রমে তাঁহার ভূতপূর্ব স্বামী নবকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া একটি চটিতে নিয়া আসেন। মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে মতিবিবি ও তখন তাঁহার অপরিচিত নবকুমারের এই সাক্ষাৎ—ঘটনা সৃষ্টির চাতুর্যে শ্রেষ্ঠ নাটকের সহিত তুলনীয়। মতিবিবি যখন শুনিলেন যে তাঁহার উদ্ধার কর্তার নিবাস সপ্তগ্রাম তখন মাটির প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া মুখ না তুলিয়া বলিলেন "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?" নবকুমার বলিলেন—নবকুমার শর্মা। প্রদীপ নিভিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এই একটি ইঙ্গিতে মতিবিবির হৃদয় রহস্য কি অপরূপ কৌশলেই না ব্যক্ত করিয়াছেন। কেবল যে পান্থশালার ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপটি নিভিল তাহা নহে, আগ্রার ভোগলালসাপূর্ণ বাসনার যে বিশাল বহ্নি মতিবিবির বুকে জ্বলিতেছিল ঐ

এক ফুৎকারেই তাহাও চিরদিনের মত নির্বাপিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহুস্থলে নাট্যধর্মী লিপিকুশলতার এরূপ অপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার আর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বিষবৃক্ষে পাই। কুন্দনন্দিনীর প্রতি স্বামীর অনুরাগ দেখিয়া সতীসাধ্বী সূর্যমুখী তাহাদের বিবাহ দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কিন্তু বহুদিনের অদর্শনের পর একবার নগেন্দ্রনাথকে শেষ দেখিবার জন্য বহু ক্লেশ সহিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া নিশীথে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ জানেন সূর্যমুখী মৃতা সুতরাং রমণী-অঙ্গের স্পর্শে বলিয়া উঠিলেন "কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্যমুখীকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তুমি যদি সূর্যমুখী হইতে পারিতে তবে কি সুখ হইত।" এই একটি উক্তিতে সূর্যমুখী যাহা জানিলেন নগেন্দ্রনাথের সহস্র সান্ত্বনা বা চাটু বাক্যেও তাহা সম্ভব হইত না। তাই সূর্যমুখী বলিয়া উঠিলেন "আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল।"

এ প্রসঙ্গ আর বাড়াইব না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সে শক্তিও আমার নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া জীবনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার অন্ততঃ একটুও প্রকাশ না করিলে তাঁহার স্মৃতি বাসরে আমার হৃদয়ের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাই দু'একটি কথা বলিলাম। উপন্যাসের মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে আমাদের চিত্তজয় করিয়াছিলেন—এবং ইহাই যে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার মাধ্যমে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রধান হইলেও ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবদান নহে। অন্যান্য নানা দিক দিয়া তাঁহার যে প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাও আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের কথা আজ সর্বজন বিদিত। যে কয়েক-জন মহাপুরুষ জাতীয় জীবনে এই নবযুগের প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। এই মহাপুরুষেরা বিভিন্ন উপায়ে দেশের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি নূতন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যেই এদেশে নবযুগের পথ নির্মাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বাংলা ভাষায় রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন আজিও তাহা পাঠ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। সে যুগে বঙ্গভাষায় প্রচার কার্য যে কত বড় দুঃসাহসের ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক ছিল আজ আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। প্রথমতঃ সে যুগের অপরিণত বঙ্গভাষা উচ্চ চিন্তার ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের বাহন হইবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নব্যযুগের প্রবর্তক শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন ইংরেজী সাহিত্যের প্রবলস্রোতে ভাসমান। ভূদেববাবুর ভাষায় তাঁহারা ইংরেজীতে কথা বলিতেন, চিন্তা করিতেন, এমন কি স্বপ্নও দেখিতেন। ইংরেজী রচনার দক্ষতাই

ছিল তখন শ্রেষ্ঠতার একমাত্র মাপকাঠি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও **Adventure of a young Hindu** ও **Rajmohan's wife** নামে দুইখানি ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জন করেন। এই সর্বজনাকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আশা ত্যাগ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টিরূপ দুরূহ ও অনিশ্চিত সাফল্যের পথে বঙ্কিমচন্দ্র কেন অগ্রসর হইলেন, তাহার কারণ তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

'প্রথমতঃ আমরা যতই ইংরেজি পড়ি বা বলি, তিন কোটি বাঙ্গালী পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন কখন তিনকোটি সাহেব হইয়া উঠিতে পারিবে না, এবং নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেশের লোক ইংরেজী বুঝে না, কখনও বুঝিবে না ; সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিনকোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সমস্ত লোক বুঝে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ ভাষার বিভিন্নতার ফলে এক্ষণে আমাদের ভিতর উচ্চ-শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই এবং এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। এই সমুদয় কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, শতবর্ষ পরে বাঙ্গালী আজ তাহার মর্ম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কেবল বঙ্গভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। যে বঙ্গসাহিত্য দ্বারা তিনি জাতীয় নবজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁহার সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ ছলে তিনি লিখিয়াছেন। "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন—তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্বোক্ত দুই উদ্দেশ্য পরস্পরের পরিপূরক—সৌন্দর্য সৃষ্টি উপন্যাসের বা কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেশের ও মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। এই আদর্শ অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি একদিকে যেমন সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষের সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি গৌণভাবে কিরূপে লোকশিক্ষার সহায়তা এবং সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মুখ্যতঃ লোক শিক্ষার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে বাংলার নবজাগরণে তাঁহার অবদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

ধারণা করা সম্ভব নহে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'; এই সঙ্গে তাঁহার সম্পাদিত মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহাই বাংলাভাষায় "সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক।"

বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা এবং ভারতে যে নবযুগের আবির্ভাব আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি, কতকগুলি নূতন ভাবের ও আদর্শের উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইগুলির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মুখ্য ও প্রধান, যেমন জাতীয়তা জ্ঞান, দেশাত্মবোধ, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর চরিত্র ও সমাজ সংগঠন, উচ্চশিক্ষা, লোকশিক্ষা, দরিদ্র ও অবনত শ্রেণীর উন্নতি, প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের উদ্ধার দ্বারা লুপ্ত, বিস্মৃত, প্রাচীন গৌরবের উপলব্ধি, জড় বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আমরা প্রায় এই সমুদয় ভাবধারারই অপূর্ব বিকাশ দেখিতে পাই। পরবর্তীকালে ইহাদের অনেকগুলি বেগবতী স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়া জাতীয় জীবন ক্ষেত্র উর্বর করিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ এমন একটিও নাই, যাহার অন্ততঃ প্রথম ক্ষীণ ধারা বঙ্কিম সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনে এমন কোন আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতিপাদন করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মাত্র দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুদ্ধার যে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না, চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।" বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি প্রবল অনুরাগ ও তাহার উদ্ধারের জন্য তাঁহার যে কি অধীর আগ্রহ ছিল তাহা তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পাঠে আমরা জানিতে পারি। অবশ্য তখন বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য প্রচলিত ছিল, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে কেহ তাহা

করেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি বর্তমানের পথপ্রদর্শক। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লিখিত বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস 'গৌড়রাজমালা'। ইহার অনুক্রমণিকার আরম্ভ এইরূপ: "বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।" বর্তমানে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার মূল প্রেরণা কোথায়, স্বর্গগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্তিই তাহা নির্দেশ করিতেছে।

আমাদের দেশের কৃষকের দারিদ্র্য ও তাহাদের সহিত শিক্ষিতদের সমবেদনার অভাব, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর বিরোধ প্রভৃতি আমাদের বর্তমান রাজনীতির প্রধান সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয়। "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে যে জ্বলন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, আজ পর্যন্তও বঙ্গভাষায় তাহার তুলনা নাই। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার ফলে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি ও অশন বসন ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয় দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, তাহার অতি মনোরম বিশদ্ বর্ণনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে?" যাঁহারা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইবার সময়ও হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতীয় কৃষকের নামই উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর ইহাদের নিদারুণ দুঃখময় প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার করুণ দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বল দেখি চশমা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর···তুমি বল দেখি যে, তোমা হতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?" তারপর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘণ্টায় উলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গলে কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।" রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিদ্রোহের পঞ্চাশ

বৎসর পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। এত সংক্ষেপে ও এত স্পষ্টভাবে ও জোর গলায় আমাদের দেশের মূল সমস্যার কথা আর কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ধর্মমত, সমাজতত্ত্ব, সাম্য ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জাতীয় আদর্শ কিরূপে ও কতটা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার সবিস্তার উল্লেখ এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। প্রতি বাঙ্গালীকে আমরা তাঁহার সমগ্র রচনাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার উপন্যাসের অনুপম সৌন্দর্যে আমরা যেন তাঁহার অন্যান্য লেখার কথা বিস্মৃত না হই। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগের কেবল শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নহেন, সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকও বটেন। এই দিক দিয়া এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়িবার যাঁহাদের অবসর অথবা অভিলাষ নাই, তাঁহাদিগকে আমরা অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সেটি 'কমলাকান্তের দপ্তর'। এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্র দোহন করিয়া গীতারূপ দুগ্ধ অর্জুনকে পান করাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার সর্বগ্রন্থ দোহন করিয়া দুর্বল বঙ্গবাসীর জন্য এই সুলভ খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং দার্শনিক ও অধ্যাত্মতত্ত্ব, রাজনীতি, লোকচরিত্র প্রভৃতি সকলেরই মূলসূত্রগুলি এই এক গ্রন্থে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবসমুদ্রে যে সমুদয় মণিমুক্তা ফুটিয়াছিল, অহিফেনসেবী কমলাকান্তের যজ্ঞোপবীত সূত্রে তিনি তাঁহার মালা গাঁথিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সহিত যে বাঙ্গালীর পরিচয় নাই, সে হতভাগ্য। 'স্ত্রীলোকের রূপ' ও 'বসন্তের কোকিল' হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক নীতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ বা কমুনিজম প্রভৃতি কিছুই এই গ্রন্থে বাদ যায় নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্তী দিব্যচক্ষে তখনকার ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিল যে, "পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু এ জাতির পলিটিক্স নাই। জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো—ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" এই দুই প্রকার পলিটিক্স কি তাহা কমলাকান্ত একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

শিবু কলুর পৌত্রের ভোজ্যান্নের প্রতি লুব্ধ কুক্কুর ধীরে ধীরে নানা প্রকার আবেদন নিবেদনের ফলে কয়েকখানি মাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কলুগৃহিণী কর্তৃক লোষ্ট্রাহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্বক পলায়ন করিল। ঠিক সেই সময়ে এক বৃহৎকায় বৃষ উক্ত কলুর জাবনা খাইতেছিল, কলুগৃহিণীর তাড়নায় ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, বরং তাহার হৃদয়মধ্যে নিজের শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল এবং কলুগৃহিণীকে রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। কমলাকান্ত বঙ্গবাসীকে

এই দুরকমের পলিটিক্স দেখাইয়া মন্তব্য করিলেন, "বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের পলিটিশ্যন, আর উল্‌সী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দলের পলিটিশ্যন।"

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পলিটিক্সের প্রকৃত স্বরূপ কমলাকান্তের এই কয়টি কথায় আশ্চর্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য কোন্ রকম পলিটিক্স আবশ্যক, সে বিষয়ে বৃদ্ধ কমলাকান্তের উপদেশ ভারতবাসী তখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এই উপলব্ধির পরিচয় প্রথম পাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে। বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই গ্রন্থ বিশেষতঃ বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসিদেশের ভলটেয়ার ও রুসোর রচনা ও জাতীয় সঙ্গীত "লা মার্সেলিস" ব্যতীত তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে এমন কিছু আমার জানা নাই।

আন্তর্জাতিক পলিটিক্স সম্বন্ধেও বৃদ্ধ কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টি অতি আশ্চর্যরকমের আধুনিক: প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু চুরির মামলায় তিনি ইউরোপের International Law এর সারমর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—"যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা।" এই প্রসঙ্গে কমলাকান্ত আরও প্রচার করেন যে, যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অর্ধ শতাব্দী পরে রাশিয়াতে লেনিন ও ট্রট্স্কি এই মহৎ নীতির প্রচার ও অনুসরণ করেন এবং ক্রমে পৃথিবীর বহুদেশ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করে। বঙ্গদেশেও 'লাঙ্গল যার মাটি তার' এই সুরে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কমলাকান্তী নীতিরই ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ মাত্র। জগতের অতি আধুনিক গণতন্ত্রবাদের মূল সূত্রগুলি একটি বিড়াল অতি সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, কমলাকান্ত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গণতন্ত্রবাদীদিগের মধ্যেও যাহারা চরমপন্থী সেই প্রুধোন বাকুনিনের 'অ্যানর্কিজম্' বা 'স্বেচ্ছাচারিতা-বাদ' ও এই মার্জার পণ্ডিতের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কি আশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা দিতেছি। "পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তাবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।" শতবর্ষপরে আজ এই মতবাদ কেবল বিড়ালের নয়, ভারতের জনগণের মূলমন্ত্র হইতে চলিয়াছে।

কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন যে, "মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়।" হারান মনের সন্ধানে পাকশালায়, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গবাক্ষতলে এবং রূপসী যুবতীর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কোথাও মনচোরের সন্ধান পাইলেন না। তারপর তাঁহার

দিব্যদৃষ্টি হইল, বুঝিলেন, "ধন যশ ইন্দ্রিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।" কমলাকান্ত তারস্বরে ঘোষণা করিলেন, "আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল্য নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধনমান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব। কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে। ফলিবে, কিন্তু কত দিনে? হায়, কতদিনে!"

কমলাকান্তের আশা আজ মানবজাতির একমাত্র আশা। জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষে পৃথিবীতে যে প্রলয়ের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার উপশমের জন্য রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক মনীষিগণ নানাভাবে যাহা প্রচার করিয়াছেন, একশতাব্দী পূর্বে কমলাকান্ত তাহারই মূল দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিষময় ফল আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কমলাকান্ত তাহার প্রকৃত কারণ ও নিবারণের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, "মেটিরিয়াল প্রস্প্যারিটি বা বাহ্যসম্পদ ইংরেজী সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সব বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

"তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই, নহিলে নয়। এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে তাহার চেষ্টা মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী। তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।"

কমলাকান্তের এই উপদেশ এখনও সভ্য সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার অন্য পথ নাই। বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যত বড় বড় আদর্শেরই প্রচার হউক না কেন, কমলাকান্তের প্রস্তাবিত পথ ভিন্ন মানব-জাতির উদ্ধারের উপায় নাই।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে কত দার্শনিক তথ্য, ধর্মতত্ত্ব, মানব মনের গূঢ় রহস্য, মানব জাতির বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্যতের আদর্শ সরল সরস রচনায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই গ্রন্থে কমলাকান্তের ছদ্মবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মূর্তি দেখিতে পাই, তাহা প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, আদর্শে মহান্,

সহৃদয়তায় মহাপ্রাণ এবং শিক্ষায় ও বুদ্ধির প্রাখর্যে ভাস্বর; লোক-শিক্ষক, যুগপ্রবর্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের যে আদর্শ ও ভাবসম্পদ তাঁহার বিশাল রচনাবলীর মধ্যে পাই, এই একখানি মাত্র গ্রন্থে তাহার সারমর্ম নিহিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি দিক এই গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বড় পণ্ডিত, দার্শনিক, লোকশিক্ষক ছিলেন সত্য, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী—বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান। তিনি বাঙ্গালা দেশকে নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, ইষ্টদেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং প্রণয়িনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। সাতকোটি বাঙ্গালী যাহাতে মানুষ হইয়া আবার বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারে, এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ও সাধনার লক্ষ্য। তিনি যে বাঙ্গালীর চরিত্রের কুৎসা ও কলঙ্ক প্রচার করিয়াছেন, তাহা কেবল মনের গভীর দুঃখে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য। দুর্গা প্রতিমার মধ্যে তিনি বঙ্গমাতারই মূর্তি পূজা করিতেন, বঁধুয়ার বিরহ সঙ্গীতে তাঁহার মনে পড়িত বঙ্গভূমির অতীত গৌরবের সুখস্মৃতি। সে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন নাই তাই তিনি নবদ্বীপের শ্মশান ভূমির প্রতি চাহিয়া যে স্বগত বিলাপোক্তি করিয়াছেন—এমন কে বাঙ্গালী পাঠক আছে. যাহার হৃদয়ে সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি জাগে নাই? 'আনন্দমঠের বিশাল পটভূমিকায় দেশের প্রতি যে বেদনাবোধ আত্মবিকাশ করিয়াছিল, কমলাকান্তের দুর্গোৎসব ও বঁধুয়ার গীতের মধ্য দিয়া তাহার মর্মভেদী রূপ পাঠকের অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কেবল সাহিত্যের উচ্ছ্বাস নহে, তাঁহার হৃদয়ের অকপট অভিব্যক্তি। এই দেশ-প্রেমের স্বরূপ ও তাহার প্রকৃত ভিত্তি কি, তাহা আনন্দমঠে বিবৃত হইয়াছে। দেশের জন্য জীবনসর্বস্ব পণ করাই আমরা দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া জানি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে এ আদর্শকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আনন্দমঠের ভূমিকার উপসংহার—"নিবিড় অন্ধকারে বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে দেশসেবকের আকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?" উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তর বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব"। প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" প্রশ্ন হইল আর কি আছে? "আর কি দিব?" তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

বাঙ্গালী যে দেশের জন্য জীবন দিতে পারে, তাহার অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও উচ্চ ও যে মহৎ ভক্তি, দেশমাতৃকা তাঁহার সন্তানগণের নিকট হইতে তাহারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন। সেই ভক্তির মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। যে ঋষি সেই অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি ও এই নূতন ভক্তি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার জন্মতিথিতে বাঙ্গালীমাত্রই যেন তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়।

(১৬ আষাঢ় ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ)

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরাণ ঐতিহ্যের একটি বিশেষ প্রকরণ তাঁর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের পর ভারতচেতনা পুরাণ বাহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবের পর ভারতের পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে পড়লে খ্রীস্টীয় শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ জনসমাজে ধর্মকর্ম, ইতিবৃত্ত, আচার-আচরণকে পুনরায় নৈষ্ঠিক অনুশীলনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সমাজে সদাচার ও ত্রিদেবতাশ্রয়ী পৌরাণিক অনুভাবনাকে নানাভাবে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, হব্যকব্য, যাগযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল—বৌদ্ধধর্মের nihilism ধরণের সর্ববৈনাশিক শূন্যতা, তত্ত্বের দিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনের দিক থেকে মারাত্মক। বৌদ্ধধর্ম ভাঙল অনেক কিছু। 'ত্রিশরণ'-এর ত্রিশূলের খোঁচায় বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নেতিবাদী শূন্যতা মানুষের মনে স্থায়ী সান্ত্বনা এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। সঙ্ঘারাম গৃহজীবনের সুখশান্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যপন্থী শাস্ত্রযাজী সম্প্রদায় যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করেননি, তার সাক্ষী হচ্ছে পুরাণ ও উপপুরাণ নামে ছত্রিশখানি গ্রন্থের প্রচার। এই পুরাণ সাহিত্য বেদব্যাসের রচনা বলে চললেও এগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু জনের চেষ্টায় রচিত হয়েছে। অনেকের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাণগুলির পৌর্বাপর্য, গঠন ও রচনার মধ্যে অনেক স্থলে শিথিলতা প্রবেশ করেছে। কতকগুলি তো অর্বাচীন কালের রচনা। তাই কেউ কেউ (উইলসন) পৌরাণিক সাহিত্যকে হাজারখানেক বছরের রচনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্‌তারনিৎজ স্বীকার করেছেন যে, পুরাণের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। (১) অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুরাণেরও উল্লেখ আছে। সূত্র-সাহিত্যেই বোধ হয় পুরাণের যথার্থ গড়নটি ধরা পড়েছে। 'গৌতমধর্মসূত্র' এবং 'আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে' পুরাণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি অতি প্রাচীন, খ্রীস্টের জন্মের চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বের রচনা। সুতরাং অনুমান পুরাণের পূর্বরূপ খ্রীস্টের জন্মের পরে নয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের মহাকাব্যে, বিশেষতঃ মহাভারতের গড়নটিতে পৌরাণিক ছাঁদ লক্ষ্য করা যাবে।

---

(১) M. Winternitz—*A History of Indian Literature*, Vol. I, Part II, 1963 (C U.) Pp. 455-56

ভারতীয় আর্যসমাজে খ্রীস্টের জন্মের পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্বথেকে পুরাণের ধারা বহমান থাকলেও, আমরা যে-আকারে পুরাণগুলিকে পাচ্ছি তা খুব সম্ভব ১ম খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুরাণকে অর্বাচীন বললেও ভ্যান্‌স্ কেনেডি উইলসনের এই অভিমত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পুরাণগুলি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক। একাদশ শতকের তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেরুনী আঠারটি পুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য এবং বিষ্ণুপুরাণ পড়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং উইলসনের পুরাণের কাল-সম্পর্কিত অভিমত মেনে নেওয়া যায় না। সে যাই হোক, পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত) পুরাণ গ্রন্থ আদৌ অর্বাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুরাণে কবিত্ব ও রূপকের ভাষায় এমন সমস্ত বর্ণনা আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এতে যেসব দেবদেবীর বর্ণনা মুনি ও রাজবংশের তালিকা এবং আরও সম্ভব-অসম্ভব বর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু অংশ বালসুলভ মনে হতে পারে। (২) কিন্তু এর বাহ্য বিস্তার ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছেড়ে দিলে এর মধ্যে একযুগের সমাজজীবন ও ব্যক্তিমানসের চমৎকার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা স্বীকার করতে হবে। পুরাণ ইতিহাস না হলেও, ঐতিহাসিক উপাদানের খনি। খ্রীস্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যন্ত পৌরাণিক ভাবধারা ও আদর্শ সমগ্র ভারত-মানসকে ধারণ করে রেখেছে। আধুনিক যুগের ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য-সমাজ প্রাক্-পৌরাণিক শ্রৌতযুগে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেও সেকাল এবং একালের হিন্দুভারত কতটুকুই বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? উপনিষদ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন তো করাঙ্গুলি-গণনীয় মুমুক্ষু মানবের আধ্যাত্মিক পলান্ন। বস্তুতঃ

(২) পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যাই বলুন, একালের অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভারতীয় পুরাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিনতারনিৎজ মণিলাল দ্বিবেদী নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে স্টকহলমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টালিস্ট্ কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ভিন্‌তারনিৎজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ "As a man of Western education he spoke of anthropology and geology, of Darwin and Haeckel, Spencer and Quatrefages, but only in order to prove that the view of life of the Puranas and their teachings upon the Creation are scientific truths, and he finds in them altogether only the highest truth and deepest wisdom—if only understands it all correctly, i. e., symbolically."

—Winternitz-Ibid, p. 464

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আর্যধর্ম, পরে হিন্দুধর্ম, একালে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম,—যে ধরণের প্রেরণা ও নির্দেশ ভারতীয় হিন্দুসমাজকে চালনা করেছে, তার প্রায় সবটাই পুরাণাশ্রিত। বিষ্ণু ও শিবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মমহামণ্ডল গড়ে উঠেছে, মুনি-ঋষি-দেবতারা যে পরিমণ্ডলের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কল্পনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও ভূগোলে যে সমস্ত যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্বাদির বিচিত্র শোভাযাত্রা খ্রীস্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে একাল পর্যন্ত প্রসৃত—তার মূলটা পৌরাণিক।

২

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত সাহিত্যের সন্ধান পেলেন, তখন থেকে পুরাণের প্রতি তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বোধ হয় উইলসন-ই সর্বপ্রথম তাঁর *Essays on Sanskrit Literature* (1832)-এ এবং তাঁর অনূদিত বিষ্ণুপুরাণে পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভ্যান্‌স্ কেনেডি তারও এক বছর আগে *Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology*-তে পুরাণের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। ইউজেন বুর্ণ্‌ফ, জুলিয়াস এগেলিং, মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, উইনডিশ, লুডার্স, পার্জিটার, ফার্কু'হার— এঁরা নানাভাবে পুরাণের প্রামাণিকতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিশাল সাহিত্যের অনেক বিচিত্র দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। এঁদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক আচারানুষ্ঠান ও ভাবধারা ইদানীং ভারতে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পুরাণ-কেন্দ্রিক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকটা বজায় আছে। সুতরাং হাজার দুই বছরের ভারতীয় মানসের মূল রহস্য বুঝতে গেলে পুরাণসাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে তাঁরা নানাভাবে সে কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশে একালে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে দু'-এক কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুরাণের ঘোর বিরুদ্ধতা করে দোম আন্তোনিও দো রোজারিও নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী ক্যাথলিক খ্রীষ্টান 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে' অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় আচার-আচরণকে নিন্দা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার। পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ করে তৎস্থলে 'মথিলিখিত সুসমাচার' প্রচারের দিকেই তাঁরা নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। তাঁরা কুক্রিয়াসক্ত ও পুতুলপূজক কৃষ্ণকায় হীদেনদের যিশুখ্রীষ্টের করুণার ধর্ম অর্থাৎ 'Religion of Mercy'-র ছায়াতলে আনতে চেয়েছিলেন। এ কার্যে কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখলেন, সমগ্র হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত পুরাণের অপ্রতিহত প্রভাব। তখন তাঁরা পুরাণকাহিনী ও *Motif*-এর

মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকতা ও দুর্নীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য হেলেনীয়, হিব্রু ও খ্রীস্টানী শাস্ত্রসংহিতা ও পুরাণে যে অনুরূপ ব্যাপার প্রচুর আছে (৩) এবং পৌরাণিক যুগের সাহিত্য ঐ রকমই হয়ে থাকে, একথা তাঁরা মানতে চাননি—ধর্ম-প্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ।

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিরোধ বাধে তারও মূল কারণ—এই পৌরাণিক সংস্কারের মূল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ। মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণ তন্ত্রাদির নিন্দা করলে রামমোহন 'ব্রাহ্মণসেবধি'-তে বলেন যে, মিশনারীরা হিন্দুর পুরাণ-গ্রন্থকে যে জন্য নিন্দা করছেন, ঠিক অনুরূপ ব্যাপার খ্রীস্টানী সাহিত্যেও আছে। তবে ভারতীয় পুরাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। সংস্কৃত পুরাণ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরোপাসনার প্রাথমিক সোপান। উচ্চস্তরে উঠলে পুরাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দুধর্ম ও সাধনার সারভাগ—মিশনারীরা যার বিশেষ সংবাদ রাখতেন না। রামমোহন এইজন্য 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'তে তাঁদের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালের একেশ্বরবাদী রামমোহন পুরাণের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখাননি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদান্তের জীব-ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদ তত্ত্বতঃ একবস্তু নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা সমাজসংরক্ষণের জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অপরদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দল, খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় বঙ্গ-সন্তানগণ এবং রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীরা—একে অপরের সঙ্গে নানা বিষয়ে

---

(৩) রামমোহন, বাইবেলের মধ্যে যে একই রকম পৌরাণিক জ্ঞানবিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন ; "অতএব মিসনরি মহাশয়দিগের বিনয়-পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যিশুখ্রীষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কিনা……তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কিনা ও তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কিনা এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিত কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কিনা যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নামরূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।"— ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২

মতপার্থক্য অবলম্বন করলেও, একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল। তা হল পুরাণাদির প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুরাণ অনূদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচারলাভ করেছিল। বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিষ্ণু-কৃষ্ণবিষয়ক পুরাণের মুদ্রণ ও প্রচার ধর্মীয় কৃত্যের অন্যতম অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও একাধিক বৈষ্ণব পুরাণ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মমত প্রভৃতি সিঁড়িগুলি একে একে পার হয়ে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তিকায় স্বীকার করেন, "নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।" 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' পুস্তিকায় তিনি যে 'হিন্দুমহাসমিতি' গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীরা উপেক্ষিত হননি। তাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমিতির কার্য আরম্ভের পূর্বে "কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেবপূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে।" তাঁর মতে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম দু'দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথম—এই বিশেষ দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন করে উপনিষদ-বেদান্তাদি নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্বে পৌঁছান সবচেয়ে সহজ। দ্বিতীয়—সমগ্র ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির দিক থেকে একতাবদ্ধ করতে হলে সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থাৎ পৌরাণিক মত, তাকেই অবলম্বন করতে হবে। রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীর দল, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানের 'কৈশবীদল' ও ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এঁদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষৎ মতপার্থক্য থাকলেও এঁরা সকলেই কমবেশী পুরাণবিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় ততটা পুরাণবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ভক্তির আবেগে পুরাণোক্ত দেবদেবীকে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হননি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেছিলেন। পুরাণ-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাস ছিল।

৩

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে ব্রাহ্মসমাজ পারস্পরিক বিরোধে কিছু হীনবল হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক ব্রাহ্ম পুরাণকে আর কুসংস্কার বলে অবহেলা করলেন না। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের যুব-সমাজের উত্তেজনা ক্রমে ক্রমে ধর্মকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবায় সঞ্চারিত হল। এরই কিছু পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদেরা পুরাণের ইংরেজী অনুবাদ করে এবং পুরাণের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে শিক্ষিত ভারতবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি এর প্রতি ফেরাতে সমর্থ হলেন। এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ঝোঁকে ব্রাহ্মসমাজ ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দিকে ঢলে পড়েননি। তিনি হিন্দুর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিজাতীয়

বিশেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর এবং পরবর্তীকালে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' আলোচনা করার সময়ে হিন্দুধর্ম ও পৌরাণিকতা সম্বন্ধে নতুনভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইমস্টিটিউশন-এর অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টির সঙ্গে তাঁর লিপিযুদ্ধ থেকে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তও বোঝা যায়।

১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'প্রচারে' "রাধাকৃষ্ণ" নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরদাস বাবাজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন ঃ

> "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া এই ধর্মার্থরূপকটি গঠন করিয়াছিলেন।…কৃষ্ণ রূপক নহেন…তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত রূপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা স্বীকার করেননি। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> "ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগের সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসে কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।"

এখানে লক্ষ্য করা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তাঁদের সাকার বলে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং সেই সমস্ত পৌরাণিক কথাকে "অদ্ভুত উপন্যাসের বিষয়" বলে কিছু ব্যঙ্গই করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে একটু গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তিনি প্রকারান্তরে পৌরাণিক দেববাদ ও ঐতিহ্যকে বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম খণ্ডে তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলে স্বীকার করেছেন—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসর্গিক, অসম্ভব ও অবাস্তব—এমন বিস্তর ব্যাপার অন্যদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজস্র আছে। লিভি, হেরোডোটস,

ফেরিশ্‌তো প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসকারগণ সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের রং মেশাতেন। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্যে ও ইতিহাসে এই ধরণের অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যাবে। সেই অতিরঞ্জন ও অলীক কথা থেকে পুরাণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে রক্ষা করতে পারলে তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের নতুন স্বরূপ ফুটে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করলেও নবজাগ্রত বাংলা সাহিত্য—যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বলা হয়, তার মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—এরা সকলেই পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেছিলেন। অবশ্য প্রাচীন পুরাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেবরেই গ্রহণ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে পুরাকথাকে মার্জিত করে নিয়ে সাহিত্যে তাকে গ্রহণ করা—ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনৈসর্গিকতা, অতিরঞ্জন ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রক্ষেপের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুরাণে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার অনুপ্রবেশ করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা করে একালের অনেকে পুরাণের বাগ্‌বাহুল্যের মধ্য থেকে প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। কেউ প্রাচীন কাহিনীর অন্তরালে রূপকাশ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-বা পুরাণের মধ্যে একালের ইতিহাসের অনুরূপ ব্যাপার সন্ধান করছিলেন।

পৌরাণিক দেবমণ্ডলের দুই প্রধান কুলপতি বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয়। এই নব্য বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীন ভাগবতধর্ম নয় বা মধ্য যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নয়। আধুনিক জীবন ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় একধরণের মানবহিতবাদমূলক নৈতিক আদর্শের পটভূমিকায় কৃষ্ণকে উপস্থাপনার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয়। নবীনচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' মহাকাব্যে কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সমাজ, যাঁরা মোটামুটিভাবে পরম্পরাগত ভারত-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা পুরাণের কৃষ্ণকেই নতুন করে যুগোপযোগী করে নিতে চাইলেন। এই মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পৌরাণিকতা। পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন না দিয়ে তার অতিরঞ্জন ও রূপকের খোলসের মধ্য থেকে যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা, ইতিহাসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুঁজে বার করা—এই যুগের আধুনিক শিক্ষিতসমাজে এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এর একটা উগ্র

chauvinistic রূপ শশধর তর্কচূড়ামণির (৪) প্রচারের মধ্যে ফুটে উঠল যা বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেনি। সে যাই হোক, ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও খ্রীস্টান মধুসূদন রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা করে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করেননি। তাঁর পূর্বে বিদ্যাসাগর, যিনি পৌরাণিকতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না, তিনিও ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত'-এর কিয়দংশ রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তাঁর অন্যতম ভক্ত ও পার্শ্বচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়কে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ('চিরঞ্জীব শর্মা') তাঁরই নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কথনও কথনও আবেগ বশতঃ 'নির্বিকার হরি' এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন :

> "মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তির দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক, পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা !...এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"
> ('আচার্যের প্রার্থনা')

আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র পৌরাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন একথা স্বীকার করতে হবে।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করবার জন্য একটি জীবন্ত বিগ্রহ খুঁজছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কোঁৎ-পন্থী হলেও পরবর্তী কালে তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সংযুক্ত করেছিলেন। এই সেশ্বর কোঁৎদর্শনই তাঁকে অনুশীলন ধর্ম (*Religion of Culture*) (৫) অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যীভূত মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল।

---

(৪) 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের ('প্রচারে' প্রকাশিত) পাদটীকায় শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন : "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।" ('বিবিধ প্রবন্ধ'—বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭)

(৫) লণ্ডন য়ুনিভারসিটি কলেজের ল্যাটিনের অধ্যাপক স্যর জন রবার্ট সীলী (১৮৩৪-৯৫) মূলতঃ ছিলেন ইতিহাসে আসক্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থ (*Ecce Homo, 1865*) খ্রীস্টানধর্মসংক্রান্ত, যাতে তিনি খ্রীস্টের ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই গ্রন্থেই

"গৌরদাস বাবজির ভিক্ষার ঝুলি" ('বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় খণ্ড) এবং 'ধর্মতত্ত্বে' (ক্রোড়পত্র-খ) গুরু-শিষ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় বৈরাগ্যবাদ বা মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানী সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। মানববৃত্তি-সমূহের সুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুরুষার্থে (ঈশ্বরভক্তি) উন্নয়ন—একথাই তিনি ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুর ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মার অন্তরে। এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, আচারসর্বস্ব কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হিন্দু হিন্দু নয়, বরং আচারবিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবনযাপনকারী ব্যক্তি—তিনিই যথার্থ হিন্দু। এই দুই ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দু ধর্ম কি? একব্যক্তি ধর্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম না ধর্মই ধর্ম? যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়" ('দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম')। অর্থাৎ আচার নয়, সদ্ধর্মগামী নরোত্তমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। সেই সর্বোত্তম নরোত্তমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য অনুশীলন করতে লাগলেন, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রম করে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে সেই আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধারণ করলেন। এ সম্পর্কে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপক্রমণিকা থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে:

> "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণে ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।"

বলা বাহুল্য এই 'পাপোপাখ্যান'-এর প্রায় সবটাই কৃষ্ণ-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণ-রাধা-গোপীলীলার প্রতি অতিশয় প্রতিকূল

তিনি সবিস্তারে অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১২৯১ সালে প্রকাশিত "দেবীচৌধুরাণী" এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ধর্মতত্ত্বে (১২৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর বচন উদ্ধৃত করেছেন—"The substance of religion is Culture ; the fruit of it, the Higher Life". (*Ecce Homo* P. 145) তাঁর চিন্তায় সীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয়।

ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, "এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাস মাত্র, ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই।" 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'—গীতার এই বাণী সত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পরদারাভিমর্ষণ বলে নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব হানিকর উপন্যাস অতিশয় অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধন অনেক সময়ে তাঁর কাছে "কামকুসুমদামশোভিত" ইন্দ্রিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' ও জয়দেব সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা এই ধরণের প্রতিকূল—"যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব।" তাঁর ধারণা, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে "কৃষ্ণচরিত্র বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য।" কেবল কালধর্মে তাতে অনেক অযথা দুর্নীতিপূর্ণ গালগল্প স্থান পেয়েছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতে যে ধরণের কৃষ্ণ-গোপীলীলা বর্ণিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু মাঝখানে বাদ সেধেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এ পুরাণের প্রাচীন রচনায় কি ছিল জানা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে যা প্রচারিত হয়েছে তাতে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র আদি-রসের উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে। তাঁদের আচার-আচরণ ভাববৃন্দাবনের তুরীয়লোক ছেড়ে ভৌমবৃন্দাবনের ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব দেখা যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ।" সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্র এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণের অনৈসর্গিক বাল্যলীলা এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের এইভাবে ধমক দিয়েছেন—"যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ" (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়)। এই ধরণের লীলাকে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' আধ্যাত্মিক বলে শোধন করেছেন—"সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করামাত্র।" অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণের গোপীলীলাকে তিনি 'with a grain of salt' গ্রহণ করতে চান—আদিরসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে রাধাকে প্রত্যক্ষ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে অবিকল তার মতো ছিল না, তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ১৩ই জুন দক্ষিণেশ্বরে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন:

'একজন ভক্ত বলিলেন, "শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।" —কথামৃত, ৩য়।

পরে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, "ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।" তখন 'প্রচারে' কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে পূজার প্রাক্কালে কৃষ্ণচরিত্র 'প্রথম ভাগ' নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এর ছ' বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম সংস্করণের চেয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ও বিশাল আকারে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ছ' বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন:

> প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।"

'আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ' বাক্যাংশের অর্থ—প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ-চরিত্রের যাবতীয় অলৌকিকলীলা, যা নৈসর্গিকতাকে লঙ্ঘন করে এবং রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গোপীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত করে তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ) মানস-বিকাশ' নামক একখানি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এর পর প্রায় দু' বছর পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৮১, চৈত্র), 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> "বৈষ্ণব কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।"

এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন—মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি এক চরিত্র? "চারিজন গ্রন্থকারই (অর্থাৎ মহাভারতের ব্যাসদেব, ভাগবতকার, জয়দেব ও বিদ্যাপতি) কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক-প্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?" অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিৎ জবাব দেবার চেষ্টা করলেন 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) গ্রন্থে "কৃষ্ণচরিত্র" নিবন্ধে। 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁকে পরিত্যাগ করেননি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ), যখন 'প্রচারে'র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 'প্রচারে' প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি কৃষ্ণচরিত্র লিখতে থাকেন। এর কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ঐ 'প্রচারে'-ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পরিচ্ছেদ ('প্রস্তাব' ও 'যাত্রা'—দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ' বছর পরে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ-গোপী-লীলাদি আদিরসের কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিয়েছেন, অবশ্য আবিল আদিরসকে ভক্তিরসের গঙ্গোদকে শোধন করে নিয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণ যে বৎসর এবং যে মাসে (১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মর্ত্যলীলা নির্বাহ করলে দেখতে পেতেন, ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' এর দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার করেছেন, এমনকি বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার "আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ" হলেও এবং "সেই সকল বর্ণনার বাহ্য দৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে" (কৃষ্ণচরিত্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পরিঃ)। তার পর তিনি গীতার বচন উদ্ধৃত করে বলছেন:

> "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ—ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারী হইল।"

শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।......রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা তিনিই রাধা বা রাধিকা।"

পরিশেষে এই বলে উপসংহার করেছেন: "রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই।"

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে জগদীশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যভূত নরোত্তম, ভক্তের ভগবান, প্রার্থীর বাঞ্ছাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্মসংস্থাপনের জন্য চক্রধারী 'কলয়সি করবালম্'। তাঁর মতে "খ্রীস্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা।" কিন্তু কৃষ্ণই হচ্ছেন নরজাতির একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক। সে যাই হোক, এই সময়ে পুরাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে দুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেলে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন, "সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি-প্রণীত।" প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এঁরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে "মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।" আর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যের 'ইণ্ডোলজিস্ট'গণ, যাকে বলতে পারি আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাঁদের অনেকেই ঔপনিবেশিক দম্ভ বশতঃ প্রাচীন ভারতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক ভারতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে 'পাথুর‍্যা' প্রমাণ রয়েছে বলে সেটির খ্রীস্টপূর্ব প্রাচীনতা কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের কারও কারও মানসিক 'অ্যালার্জি' আছে। "তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারত পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য।"(৬) আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দুই দলকে বাদ দিলেন। এ ছাড়া আর এক দল আছে। এঁরা হলেন ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণকারী। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঝাঁঝালো হলেও অযৌক্তিক নয়—"যাঁদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না,"—বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেরুদণ্ডী জীবদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও "দেশবৎসল ও সত্যপ্রিয়", বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্যই কৃষ্ণচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথবা শাস্ত্রচর্চার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণালোচনা এবং কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হননি। কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যার মধ্যে দৈবী মহিমা নয়, মানুষের মর্যাদাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

---

(৬) 'লোকরহস্যে' "রামায়ণের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত" কৌতুক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের পল্লবগ্রাহী বিলাতী পণ্ডিতদের সরস ব্যঙ্গ করেছেন।

পুরাণাদি বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুরাণকারেরা কোন কোন স্থলে কৃষ্ণকে ভূতলচারী সামান্য মানুষে পরিণত করেছেন; মানুষের নানা ধরণের চারিত্রিক দুর্বলতাও তাঁর চরিত্রে রয়েছে। মহাভারত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুরাণের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, যে পুরাণ যত অর্বাচীন, তাতে কৃষ্ণচরিত্রের অনৈসর্গিকতা ও মানবিক দুর্বলতার ভাগ তত বেশী। (৭) শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণ কেন, শৈব পুরাণেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালের পাঠক চমকে উঠবেন। বলা বাহুল্য পুরাণগুলি একসময়ে বা একহাতের লেখা নয়। হাজারখানেক বছর ধরে পুরাণের বহু পুঁথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপার উচ্চতর দার্শনিকতার সঙ্গে অবিরোধে এর মধ্যে বাস করে আসছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, দেবভাষায় লেখা পুরাণমাত্রেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তাঁর পক্ষে পুরাণকথাকে পুরোপুরি হজম করা কঠিন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে তণ্ডুল ও তুষ আলাদা করবার চেষ্টা করলেন। তিনি কালানুক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করে, কোথায় তুষের ভাগ অধিক তা নির্দেশের জন্য সাধারণ জ্ঞান, বাস্তব চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির যৌক্তিকতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। যেখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উদ্ভট অলৌকিকতার বাহুল্য প্রবেশ করেছে, সঙ্গতিবোধের অভাব ঘটেছে, পুরাণের সেই অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যাগ করবার পক্ষপাতী। অবশ্য পুরাণের মধ্যে কতটুকু প্রাচীন ও যথার্থ, আর কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। আমরা যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সম্ভাব্যতার মাপকাঠি দিয়ে পুরাণসাহিত্য বিচারে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহৃত। কিন্তু গ্রীক, হিব্রু ও খ্রীস্টানী পুরাণেও এমন অনেক গালগল্প আছে যে, তার মধ্যেও যুক্তিবুদ্ধি বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্বিত গজকাঠি দিয়ে মাপলে পশ্চিমের তামাম পুরাণ-গ্রন্থকে বাতিল করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর—যখন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাপারের প্রতি স্বাদেশিক ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুরাণকেও অশ্রদ্ধার আঘাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তার পরতে পরতে ধূলোবালি জমেছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সে মলিন আস্তরণ ভেদ করতে অপারগ হয়ে পৌরাণিক ঐতিহ্যের শুধু দোষকীর্তন করেছেন। পুরাণকে যুগসজ্জিত

---

(৭) ভিন্‌তারনিৎজ্‌ও এই মতে বিশ্বাসী। তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন, "The later the Purāṇa—this may be regarded as a general rule—the more boundless are the exaggerations." (*Indian Literature*, Vol. I, Part II, P. 465, Calcutta University, 1963.)

মালিন্য থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে মধ্যস্থ মেনে অগ্রসর হলেন। পুরাণ ভক্তিগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলেই নয়,—বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করলে এবং তণ্ডুলকণা থেকে তুষ ঝেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।(৮) এই দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক হাতে পাশ্চাত্ত্য দোষদর্শী গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্ধভক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদের নয়নে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করতে হয়েছে। পুরাণকে নবীকরণ নয়, পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথার্থ বর্ণনা স্ফীত হয়ে মূলকে আবৃত করেছে, কোথাও কোথাও বিকৃত করেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তারই বিরুদ্ধে যুক্তির অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাড্যের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করা মহাসত্ত্ববান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। 'বঙ্গদর্শন'গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় এদিক থেকে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যত্রয় আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই যুগকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরকে 'Hindu religious revival'-এর যুগ বলেছিলেন।(৯) কিন্তু revival শব্দটিতে পুরাতনের অনুবৃত্তি বোঝায়। বঙ্কিম-প্রভাবিত এই যুগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দুয়ানিকে কি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করেছিল? এ যুগে যখন ঘরে ফেরার পালা শুরু হল, তখন স্রোতোধারা গোমুখীগহ্বরে ফিরে যাবার বৃথাচেষ্টা করেনি; জীবন ও ঐতিহ্য নতুন পথেই চলতে শুরু করল। পুরাতন সাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে অনুস্বর-বিসর্গের টঙ্কার সৃষ্টি করতে চাননি। বুদ্ধি ও বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে পুরাণকে গ্রহণ করতে হবে। বেদব্যাস, বোপদেব বা অন্যান্য লেখক, যাঁরাই পুরাণ রচনা করুন না কেন, এর মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যাপার প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার থেকে পুরাণকে মুক্ত করে নিতে হবে, এবং কলুষ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয় যুগধর্ম-সন্ধানেরও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে পুরাণকে নব্যজীবনের পাশাপাশি দাঁড় করাতে হলে এই গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত্ন মহিমায় স্থাপন করতে হবে। নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডেই পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জনের মূল কথা হল মানবিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণের মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান করতে লাগলেন। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায় নেই, যা যুগধর্ম বিরোধী, পুরাণের সেই অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল না—অনেকটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-আনুগত্যের মতো। যদিও উপনিষদ মহর্ষির আত্মার খাদ্যপানীয়ে পর্যবসিত হয়েছিল, তবু তিনি বহু-

(৮) দ্রষ্টব্য: *Indian Literature* (Winternitz), Vol. I, Part II, Pp. 464-65 (Calcutta University Edition, 1963)

(৯) B. N. Seal—*New Essays in Crticism*

প্রচারিত এগারখানি উপনিষদের সব মন্ত্রই ব্রাহ্মসমাজের অনুকূল বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' নিয়ে মহর্ষি বড়োই চিন্তায় পড়লেন। আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্যসহ উপনিষদগুলি কি ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক বীজ হতে পারে? উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছা বাছা ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তা তৎক্ষণাৎ লিখে নিলেন। (১০) এইভাবে ঘন্টা তিনেকের অনুলিখনে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহর্ষি স্বানুভাবানুকূল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন,-সমগ্র উপনিষদকে নয়। এই গ্রহণ-বর্জনের কারণ কি? এ-ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধের মতো গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখাননি। তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য যার দ্বারা সিদ্ধ হবে, তিনি উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচারে নিয়োগ করেন। বঙ্কিম যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কার্যকারণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরাণিকতার যৌক্তিকতা নির্ধারণে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মোটকথা পুরাণ ও পুরাণজাতীয় ভারতীয় ঐতিহ্যের যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও স্বাভাবিকতা-অনুমোদিত এবং যা বিচিত্র হলেও অলৌকিকতার মোহমুক্ত, তাকেই আমরা নব্যপৌরাণিকতা বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের দল সেই পথের পথিক। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য এবং বেদানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই বুদ্ধিমার্গীয় বাস্তব নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারের এই রীতিটি বাংলাদেশ থেকেই সারা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ও ষড়দর্শনের প্রভাব একালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত। এখনও আমরা মুখে বেদান্ত-উপনিষদের কথা বললেও আচারে আচরণে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ঘোরতর পৌরাণিক। ইদানীং সার্বজনীন পূজাপার্বণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা যে কোনও সুদূর ভবিষ্যতেও স্থূল পৌরাণিকতা ছেড়ে সূক্ষ্মতর উপনিষদ-বেদান্ত তত্ত্বে উপনীত হব এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত নব্যপৌরাণিকতার একটি দুর্বলতর দিক আছে। শুধু যুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেনে নিলে পৌরাণিক ব্যাপারের মধ্যে বহু ছিদ্র আবিষ্কার করা যাবে। স্বাভাবিকতা ও লৌকিকতার দ্বারা বিচার করলে এবং প্রাকৃত বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে পুরাণের বহু অংশ পরিত্যাগ করতে হবে। পরিত্যাগ না করলে দোটানায় পড়তে হবে। মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই ধরণের বিপদে পড়তে হয়েছে।

(১০) দ্রষ্টব্য: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (পৃঃ ১৩৪), বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৬২।

লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাঘটিত কাহিনী পরিপাক করা দুরূহ হবে। এই জন্য ভক্ত বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাকৃত এবং অচিন্ত্য বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ঠ, রাধা—সবই রূপক। (১১) তাঁর মতে, নিদিধ্যাসন করলে ঈশ্বরোপাসনার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করি ঃ

> "যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিগুর্ণ এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।" (১২)

এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন ঃ 'ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।" এই যে জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, এতে কি তাঁর অন্তরের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছিল ? 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন ঃ

> "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, ''এ জীবন লইয়া কি করিব ?" ''লইয়া কি করিতে হয় ?'' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি।......এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।'' (১৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমার্গীয় নব্য পৌরাণিকতা শেষপর্যন্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় এসে পৌরাণিকতার নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। পৌরাণিক বিশ্বাস ভারতের শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সর্বযুগের শরণ্য, এবং শুধু বুদ্ধিবিচার নয়, জীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম সত্তায় পৌরাণিক ভাবমূর্তিকে যথাযথভাবে পরিস্থাপনা—এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও বিশ্ব-সভায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। সে আর এক যুগের কথা।

---

(১১) দ্রষ্টব্য ঃ বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ড ('গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি')
(১২) গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়)
(১৩) ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায় ('ঈশ্বরে ভক্তি')

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালীসমাজকে ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহলী করেছিলেন, পুরাণের প্রতি আধুনিক ভারতীয়ের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন, এর জন্য ভারতবর্ষ তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবে।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমজন্মোৎসব সভায় পঠিত)

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ দেশে অঙ্গসজ্জা বা অন্য কোন কারণে অলঙ্কারের প্রচলন হল তা স্থির নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, মিশরে, চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অঙ্গাভরণ ব্যবহার চলছে।

উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথমেই একথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার—অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ কি। শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কার, তার মধ্যে আবার স্বর্ণালঙ্কারই একমাত্র অলঙ্কার পদবাচ্য—এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কার। অলঙ্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে এই পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতুশ্রেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতুসার হিসাবে সোনার যে মর্যাদা তা অলঙ্কারের সঙ্গে এক করে ফেললে আলাদা কথা। ধাতুর ব্যবহার খুব প্রাচীন হলেও মাত্র হাজার দশেক বছর তার বয়স, আর সোনার আবিষ্কার তারও হাজার তিনেক বছর পরের কথা। কিন্তু তারও অনেক অনেক কাল আগে থেকে মানুষ অলঙ্কার ব্যবহার করে আসছে, কিছুটা অঙ্গসজ্জার তাগিদে, কিন্তু বেশিরভাগটাই সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীবদেহাবশেষ অঙ্গে ধারণ করে অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তিকে প্রসন্ন বা শান্ত করার আধিদৈবিক প্রয়োজনে। ইতিহাসধারার এই বিষয়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম মানুষ যখন অঙ্গাবরণের ব্যবহার শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তার অঙ্গে। এই প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্কারের উপাদান, বলাই বাহুল্য, উজ্জ্বল ও মহার্ঘ ধাতু কিংবা মণিমুক্তা নয়, পরন্তু আধিদৈবিক শক্তিসম্পন্ন আপাততুচ্ছ উপাদান, যেমন, বিশেষ ধরণের ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষনির্যাস, প্রাণীর অস্থি (মাছ, উট, হাতির)। পোড়ামাটির টুকরো, চকচকে রঙীন কাঁচের প্রলেপ লাগানো পুঁতি, হরিদ্রাবর্ণ কঠিন অম্বর বা কৃষ্ণবর্ণ খনিজ জেট ইত্যাদি ধাতু ও রত্নের ব্যবহার পরবর্তীকালের ব্যাপার। অর্থাৎ বলা যায় যে, প্রকৃতির দান সত্যিকারের ফুল থেকে সুরু করে মূল্যবান্ ধাতু, মণিরত্ন, দগ্ধমৃত্তিকা সবকিছুই অঙ্গাভরণের জন্য আবহমানকাল ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণী দেহের অবশিষ্ট, সরাসরি গাত্র-চিত্রণ বা রঙ্গোলির মধ্য দিয়েও বহুক্ষেত্রে বিবিধবর্ণের অলঙ্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ইঙ্গিত আরেক গতিপথ খুঁজে পেয়েছে উল্কির মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটের বহিঃরেখা যে যে মাধ্যমে এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করছে সাম্প্রতিককালের উল্কি তার অন্যতম।

মানুষের আদিমতম অলঙ্কার যে শোভন, নয়নাভিরাম ধাতুজ কিংবা মণিময় অঙ্গসজ্জা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। নিছক সৌন্দর্যপ্রেরণা নয়, আধিদৈবিক কারণেই প্রথম যুগের মানুষ তার সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কবচের মত যে অলঙ্কার অঙ্গে

ধারণ করত তা ছিল জীবজন্তুর দাঁত, অস্থিপঞ্জর কিংবা কেশাবশেষ দিয়ে রচিত বন্ধনী বা মালা। অঙ্গাভরণের শোভাবর্ধনকল্পে তার বহিরাকৃতির সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আনয়নে কিংবা বর্ণবৈচিত্র সংযোজনে অভিনিবেশ পরবর্তী যুগের সৌন্দর্যবুদ্ধি বিকাশের ফলশ্রুতি। এমনকি সুদৃশ্য মণিমুক্তা ও দ্যুতিমান্ ধাতুর ব্যবহারও সুরু হয় আদিতে ঐ একই আধিদৈবিক সংস্কারের প্রেরণায়। বস্তুত চিরদিনই জড়োয়া ছাড়া আরও একটি পথ ধরে রত্নপ্রস্তর অঙ্গাভরণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা এবং কল্যাণকে স্বাগত জানাতে রত্নপ্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশ্বাসে আমাদের দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক রত্ন এবং শেষপর্যন্ত নবরত্ন ব্যবহার ঘটেছে। মানুষের কল্যাণের জন্য সূর্য, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র, রাহু, বৃহস্পতি ও শনিকে অনুকূল করতে একেক ব্যক্তির কোষ্ঠী ঠিকুজী বিচার করে নয়টি রত্ন কে কোথায় বসবেন তার নির্দেশ দিয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। এর মধ্যে আবার কোন কোন রত্ন নিয়ে নানান্ জল্পনা দেখা গেছে, কি জানি নীলা ধারণে রাজা হব, না সরাসরি যমরাজের দরবারে হাজির হব! শাস্ত্র বলে, শনিকে কাটাতে নীলা হল অমোঘ মহারত্ন। এসব ছাড়া মিশ্রিত ধাতু-অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। অনেক দেবদেবীও তৈরি হয়েছে মিশ্রিত ধাতুর, তার কোনটি পঞ্চধাতু কোনটি বা অষ্টধাতু ইত্যাদি।

অলঙ্কারের নান্দনিক আবেদননিরপেক্ষ এবং প্রথা ও বিশ্বাসের উপরে একান্ত নির্ভরশীল অন্যান্য কয়েক ধরণের ব্যবহারের মধ্যেও অলঙ্কারের উৎপত্তির সাধারণ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আয়ুর্বেদ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ মণিরত্নকে রোগারোগ্যে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনো অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ত আঙ্গুলে পরেন শাঁখের আংটি কিংবা বাহুবন্ধ হিসাবে লোহা বা তামার তার ব্যবহার করেন। প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেঁদা করলে চোখ ভালো থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কার উঠেছে। আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবারে হয়ত শুধুমাত্র কাঠি গোঁজা থাকে। কানের কথায় একটি প্রাসঙ্গিক পুরাণের গল্প এসে পড়ছে। এখনকার অলঙ্কারজগতে বারাণসী ঘরানার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। সেই বারাণসীর স্নানের ঘাটে নাকি দেবী দুর্গার কানের অলঙ্কার হারিয়ে যায়। হারানো অলঙ্কারের নামানুসারে সেই ঘাটের নাম হয় মণিকর্ণিকা। বর্ণানুযায়ী মণিমুক্তা ও মূল্যবান্ ধাতুর আরোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে চীন, পারস্য, আরব, মিশর, সুমের, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন এবং আজও প্রচলিত বিশ্বাসের কথা এই সূত্রে স্মরণীয়। পৃথিবীর সবদেশেই তুকতাক বা যাদুর সঙ্গে জড়ানো মাদুলি আদিযুগের সংস্কৃতি নমুনা। এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রঙ বেছে নেওয়ার প্রথা আছে। অথর্ববেদে নীলের সঙ্গে লালের মিশ্রণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা হয়েছে। ওদিকে, হিব্রু ধর্মযাজক লাল আর নীলের মেশানো পোষাক না পরে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন না।

॥ দুই ॥

অলঙ্কারের বিবর্তনে বিশেষতঃ এদেশে, লৌকিক ধারার অবদানের কয়েকটি দিকের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। অলঙ্কারজগতে লোকায়ত সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে—এক, উপাদান নির্বাচন ও রূপকল্পনায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাজে; দুই, অলঙ্কারের ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আচরণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মাণে যার উৎস লোকসমাজের সুদূর ও অজ্ঞাত অতীতযুগ। বিবর্তনের সাধারণ বিধি অনুসারে যেমন সমাজের কোন কোন স্তরে কোন কোন রীতি বা প্রণালী একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর রূপান্তরিত হতে চায়না এবং কালক্রমে এক সনাতন ও অক্ষয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী মর্যাদা লাভ করে সমাজের পূজো পেতে থাকে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায় যে সমাজের অন্যান্য অংশে অলঙ্কাররীতির বহুল বিবর্তন ঘটে চললেও সমাজের একটি বৃহৎ অংশ কমবেশি সেই প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাস বাঁচিয়ে রেখে চলেছে, কিছুটা অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু অনেকটাই ঐতিহ্যমুখী অনড় অভ্যাস ও সংস্কারের দায়ে। আবার এই সংস্কারের ঢেউ কিছুটা চেহারা পাল্টে সমাজের অগ্রসর স্তরগুলিতেও জায়গা করে নিয়েছে দেখা যায়। তবে মানবজাতির প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাসের অবিকৃত বাহ্য অনুসৃতি লোকায়ত সমাজেই বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ এখনো সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদসৃষ্ট বা প্রাণিদেহাবশেষ নির্মিত অলঙ্কার পরিধান করা হয় যা লোকসমাজের আদিতম পূর্বপুরুষ অঙ্গে ধারণ করতেন। অবশ্য সুযোগ পেলে কৃত্রিম অর্থাৎ প্রাগ্রসর সমাজের অলঙ্কারের সুলভ অনুকরণেও ঘটে যায়। তবু বলব, লোকসমাজ অঙ্গপ্রসাধনে প্রকৃতির দানের উপরেই বেশি নির্ভরশীল, এমনকি প্রথাগত কৃত্রিম গহনা ব্যবহারের মধ্যে তাদের যে মনোভাব ও অভীপ্সা ফুটে ওঠে তার সঙ্গে অভিজাত-বিদগ্ধ-নাগরজনের পরিশীলিত ও কৃত্রিম রুচিবোধও পারিপাট্যপ্রিয়তার চারিত্রিক প্রভেদ ঐকান্তিক।

এখনো পর্যন্ত এ দেশের সামগ্রিক অলঙ্কার সম্ভারের মধ্যে তুলনামূলকভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদানসৃষ্ট লোকায়ত অলঙ্কারের অনুপাত ঢের বেশি হলেও অলঙ্কারশিল্পের বিবর্তনে লোকায়ত ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান উপাদানের বৈচিত্র্যে নয়, যদিও তা তুচ্ছ করে দেখার মত নয়। এমনকি সাধারণভাবে দেখতে গেলে মূল্যবান্ ধাতু বা প্রত্নালঙ্কারে লোকায়ত শিল্প হয়ত তেমন কিছু সৃষ্ট হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগী অলঙ্কার যে তৈরি হয়নি তা নয়। আমাদের অলঙ্কার ধারায় লোকশিল্পীর অবদান স্বল্পমূল্যের অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়েছে। এইসব সুলভ অলঙ্কারের ব্যাপক প্রচলনের পেছনে রয়েছে আমাদের সর্বস্তরে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অলক্ষিত ব্যাপক প্রসার। কিন্তু লৌকিক শিল্পরীতির যেটি সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অবদান, তা হল অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অনুকরণে এমন কয়েকটি চিরন্তন ও উদ্দীপক নকশা ও মোটিফের সৃষ্টি যা অভিজাত ও প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারশিল্প শুধু গ্রহণই করেনি উপরন্ত

পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিন্যাসান্তরের সাহায্যে তাদের গৌরব এমনি বাড়িয়ে দিয়েছে যে গভীরভাবে অনুধাবন না করলে তাদের লোকায়ত উৎস আমাদের নজরে আসে না। লৌকিক অলঙ্কারের অন্যতম প্রধান উপাদান ফুল ও লতাপাতা। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ফুল বা পাতার আকৃতি অনুকরণ করে কতো যে ধাতুময় ও মণিমুক্তাখচিত অভিজাত অলঙ্কার হয়েছে তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন শিরোধার্য অলঙ্কারের মধ্যে মাল্য ছিল ফুলের মালারই ধাতব অনুকৃতি; ললমক ছিল তিন সারি সোনার পাতা দিয়ে তৈরি নক্ষত্রশোভিত মাল্যবিশেষ, আর আপীড় হল সিঁথির উপরে বিলম্বিত হার। ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুল পাতার অনুকরণে রচিত সোনার হংসতিলক। চূড়ামণ্ডন ও চূড়িকা হল যথাক্রমে পদ্মপাতা ও পদ্মফুলের মত দেখতে শিরোভূষণ। মুসলমান আমলে উত্তরভারতে শিসফুল, চৌক্ক বা ছোটিফুল নামে যে গোলাকৃতি উচ্চাবচ শিরোভূষণটি ললাটের ওপর কেশের শোভা বর্ধন করত তা ছিল চন্দ্রমল্লিকার অনুকরণে খাঁজকাটা। একটি খাঁটি বাঙালী চুলের কাঁটার নাম হল পান কাঁটা। কর্ণভূষণের অধিকাংশ আবার ফুলের অনুকরণে রচিত। প্রাচীন কর্ণপুর বা তার আধুনিক সংস্করণ যথা কর্ণফুল, চম্পা, ঝুমকা, ঝাঁপা ইত্যাদি গহনা পুষ্পাকৃতি। ঝুমকা এসেছে ধুতুরা ফুল থেকে, চম্পার পরিচয় তার নামেই। যাবতীয় ঘণ্টাকৃতি কর্ণাভরণ আসলে পদ্মফুলকে উল্টে দিলে যেমন দেখায় তারই অনুকরণে রচিত। পদ্মকোরকের সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে কাশ্মীরের রক্তাভ শঙ্খসদৃশ কর্ণভূষণে। বাঙলার পিপুলপাতার নামটিও অবিকৃত রয়েছে। প্রাচীন প্রথাগত অলঙ্কার কর্ণিকা হল তালপত্রের হৈম অনুকরণ। এক সময়ে কচি তালপাতার কর্ণভূষণ জনপদবধূর লাবণ্যকে মনোরম করে তুলেছে। আজ লোকসমাজে ও আদিবাসীসমাজে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। ওদিকে নেকলেস জাতীয় হারটি লোকায়তধারার কাছে ঋণী। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অধিবাসীরা যে ধরণের টুকরো ঘাস গেঁট বেঁধে হারের মত করে গলায় পরে, আমাদের অভিজাত গহনা নেকলেসে তার প্রভাব প্রমাণিত সত্য। উত্তরভারতের চম্পাকলি বা তার সহজ সংস্করণ জওয়াহর-এ চাঁপাফুলের মত ছোট ছোট পেণ্ডেন্ট থাকে। বাঙলার কামরাঙ্গা হার কামরাঙ্গা ফলের আকৃতি অনুসারী। বাঙালীর খাঁটি কটিভূষণ বটফল ও নিমফলের বেলাতেও একই কথা। রূপোর তৈরী পিপুলপাতার যে কটিভূষণ অভিজাতসমাজে চালু আছে তা ভারতের কোন কোন আদিবাসীসমাজে প্রচলিত অনুরূপ পিপুলপাতার পোষাক বা অলঙ্কার থেকে আহৃত। গোড়ালিতে পরবার নূপুরজাতীয় অধিকাংশ গহনাই আসলে পাকানো ঘাসের তৈরি লোকায়ত গহনার পরিমার্জিত উন্নত সংস্করণ। বাঙলার নিজস্ব গহনায় বহুবিধ শস্যদানার অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন মটরমালা হার, যবদানা ব্রেসলেট, চালদানা ব্রেসলেট, খোয়ে-নো ব্রেসলেট (খৈ সদৃশ), লবঙ্গদানা ব্রেসলেট ইত্যাদি।

বস্তুত, অভিজাতধর্মী ও লোকায়তধর্মী অলঙ্কার উভয়েরই উৎসস্থল একই এবং মূলতঃ

একই ঐতিহ্য উভয়কে পুষ্ট করেছে। তাই এই দুই ধারার মধ্যে মাঝেমাঝেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছে। বাহ্য গঠনচাতুর্য ও পারিপাট্যের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সেটা ছাপিয়ে এক মৌলিক আত্মীয়তা সহজে অনুভব করা যায়। অভিজাত অলঙ্কার শিল্প যেখানে আদিম অলঙ্কার-উপকরণকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, শুধু তাদের থেকে সংগৃহীত মৌল নকশা ও মোটিফগুলি নিয়ে নব নব সৃষ্টির কৌশলে মেতে উঠেছে, লোকায়ত শিল্প সেখানে বড়ো জোর সুলভ ধাতু ও উপকরণের সাহায্যে ঐ সব আকরস্বরূপ প্রাকৃতিক নকশা ও মোটিফের অমার্জিত ও অনিপুণ অনুকরণেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে এখনো লোকসমাজ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে অলঙ্কারের সাধ মেটায়। এখনো গাছের বীজ, কাঠ, নির্যাস, পাতা, শস্যদানা, এমনকি কার্পাস, রজন, শোলা, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অলঙ্কার রচিত হয়—সেই নির্মাণ কাজে কৌশলগত উৎকর্ষ না থাকলেও লোকশিল্পীর সহজ সরল সৌন্দর্যবোধ, অনাড়ম্বর শিল্পরুচি এবং সর্বোপরি সুনিশ্চিত নিজস্বতার ছাপ গায়ে মেখে তা এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করে। কাঠের তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক কণ্ঠাভরণ তৈরি হয়েছে। অভিজাত ধর্মেও রুদ্রাক্ষ, তুলসী এবং ঘুণির দানা এসে গেছে। অভিজাত সমাজে ঐ ধরণের লোকায়ত অলঙ্কারধারার এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শুধু শিল্পসৌন্দর্যের খাতিরেই ঘটেছে তা নয়। আসলে এই জাতীয় প্রভাববিস্তারের মূলে রয়েছে এমন কতকগুলি গভীরমূল বিশ্বাস ও সংস্কার যার উৎস মানবসমাজের শৈশবকালীন ভয়-ভাবনার ইতিহাসে লুকোনো থাকলেও যাকে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় এখনো লালন করে চলেছে সাধারণভাবে লোকায়ত সমাজ এবং বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়।

এই সংস্কার এবং বিধিনিষেধের মধ্যে কোন কোনটির গূঢ়, অলক্ষিত আবেদন অভিজাতসমাজের অবচেতনমানসে যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত ও সক্রিয় হয়ে আসছে। এই জাতীয় সংস্কারাদি সামাজিক ব্যবধান নির্বিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে বিধিনিষেধগুলি অভিজাতধর্ম নির্দেশিত বলে মনে হলেও এরা আসলে সেই অন্ধকার অতীতের স্মৃতিচিহ্ন যখন মানুষ অজানা অচেনা বিরূপ শক্তি-সমূহের নিয়ন্ত্রণে তার পার্থিব অস্তিত্ব যে সদা বিপন্ন এই আশঙ্কায় অনেক আপাত অর্থহীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অধীন হয়ে পড়েছিল। হয়ত বা যে ধরণের আধিদৈবিক সংস্কার তাকে আত্মরক্ষার্থে কবচস্বরূপ অলঙ্কার পরিধানে উৎসাহিত করেছিল, তারই স্বগোত্র কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে কিছু কিছু বিধিনিষেধ রচনা করেছিল। পরবর্তী যুগে অভিজাতধর্ম এগুলিকে সামান্য পরিশোধন করেছে হয়ত, কিন্তু আদৌ নাকচ করতে পারেনি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যুগে যুগে আমাদের দেশে লোকায়ত সমাজের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় অনুশাসন প্রচলিত ছিল। এই অনুশাসন থেকে পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংস্কারের জন্ম

হয়। কিছু কিছু সংস্কারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়ত আমরা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় না। অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কয়েকটা প্রাচীন বিধি-নিষেধ নজরে আসে। বিয়ের আংটি সংক্রান্ত অজস্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত অনন্ত বিছা, বাঙলার নোয়া. মাদ্রাজের থালি, কুর্গের পুঁতিমালা কোন কুমারী বা বিধবার অঙ্গে ওঠা নিষেধ। এই সূত্রে কোন কোন অলঙ্কারের অতীতকথা ও জন্মবৃত্তান্ত এসে পড়ে। লৌহবলয়কে মেয়েদের বন্দীদশার চিহ্ন বলা ঠিক কি না, যাবতীয় পদাভরণকে বেড়ি বলা শোভন কি না, বাহুবলয় রোম ও গ্রীসের যোদ্ধাদের ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটির প্রাচীন ব্যবহার নামমুদ্রা বা পাঞ্জাতে সীমাবদ্ধ কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্ত্বের পাহাড় তৈরি হতে পারে। আমরা বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। বাদশাহের অনুপস্থিতিতে বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে অলঙ্কার সম্পর্কিত কয়েকটি সংস্কার বিধিনিষেধের পর্যায়ে পড়ে।

॥ তিন ॥

ভারতবর্ষে অলঙ্কারের ইতিহাস অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর পুরনো। এদেশের আর্দ্রোষ্ণ জলবায়ুতে গায়ে জামাকাপড়ের বোঝা না চাপিয়ে অলঙ্কারের বাহুল্যই মানায় ভালো। এখানে অলঙ্কারের উপাদান যেমন ছড়ানো, এদেশের মানুষ তেমনি প্রাচীনকাল থেকে আত্যন্তিক অলঙ্করণপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। বহু বিচিত্র জাতির সমাবেশে এবং বহিরাগত সংস্কৃতির ঘাত অভিঘাতে এদেশের অলঙ্কারশিল্পে বৈচিত্র্য এসেছে। তবু, ইতিহাসের অন্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য বিরাজ-মান। এই ঐক্য শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। যুগে যুগে ভারতের আলঙ্কারিক প্রতিভা কতকগুলি প্রধান প্রধান আকর শিল্পনমুনাকে নতুনভাবে বিকশিত করার সাধনায় সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে তাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হয়েছে। এরও পেছনে রয়েছে সেই সনাতন দুরপনেয় ঐতিহ্যপরায়ণতা।

আমাদের দেশের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণা প্রধানতঃ দুটি পথ ধরে এসেছে। প্রথম পুরাতত্ত্বের সাহায্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খনন কাজে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের অঙ্গে যে সব অলঙ্কার আছে সেগুলি অর্থাৎ পরোক্ষ ধারণা, যে সব অলঙ্কার সরাসরি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মাল্যদানা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে ঋগ্বেদ থেকে সুরু করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার অঙ্গাভরণ, মৌর্যযুগ থেকে সুরু করে প্রাগাধুনিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনের বহুবিধ মূর্তিতে উৎকীর্ণ অলঙ্কার—সব মিলিয়ে অলঙ্কারের ধারা অনুসন্ধান করা যেতে

পারে। এছাড়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, প্রায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্যে, পুথি ও পটচিত্রণে এবং ধর্মীয় তিলক ও গাত্র আলপনায় অলঙ্কারের অনুসন্ধান চলতে পারে।

বেদে নিষ্ক নামে একরকম হারের উল্লেখ আছে। স্বর্ণরচিত স্রক্ বা মালারও উল্লেখ পাওয়া যায়। গোভিলের গৃহ্যসূত্রের এক টীকা অনুসারে স্রক্ বলতে পুষ্পরচিত শিরোভূষণ এবং স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণ দুইই বোঝাত। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে আছে যে, শিক্ষা সমাপন অন্তে ব্রহ্মচারী যখন গুরুর কাছে বিদায় নিতে উপস্থিত তখন তাঁর অঙ্গে শোভা পাচ্ছে রত্নখচিত কণ্ঠহার ও দুটি কর্ণভূষণ। কঠোপনিষদে বহুরূপযুক্ত সৃঙ্কা নামক হারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি যাবতীয় অলঙ্কারের তালিকা দিয়েছেন, স্বর্ণকার যদি সোনায় ভেজাল দেয় অথবা তার কারিগরীতে যদি কোন দোষ ধরা পড়ে তাহলে সেই কারিগরের সামাজিক শাস্তি কি হবে মনু তা সবিস্তারে বলেছেন। রামায়ণে সীতার অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়কার অলঙ্কারের শিল্পগত মান ছিল খুবই উন্নত। রামায়ণে উল্লেখিত অলঙ্কার হার, হেমসূত্র, রসনা, অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয় এবং কেয়ূর প্রভৃতি আজও কোন না কোন নামে চালু আছে। লঙ্কার রমণীকুল পরতেন বৈদূর্যমণি ও হীরক-খচিত স্বর্ণকুণ্ডল। অঙ্গদ ও কুণ্ডল ছিল স্বর্ণনির্মিত এবং তাদের যথাক্রমে 'বিচিত্র' ও 'শুভ' এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গাভরণকে সাধারণভাবে 'আবেধ্য' যেমন কুণ্ডল, 'বন্ধনীয়' যেমন অঙ্গদ, 'ক্ষেপ্য' যেমন নূপুর ও বস্ত্রাভরণ এবং 'আরোপ্য' যেমন হেমসূত্র ও বিবিধ হার—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া মস্তক, কর্ণ, গ্রীবা, আঙ্গুল, কটিদেশ ইত্যাদির জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহার্য নানান্ আভরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসা ও আভরণ ধারণ উভয় উদ্দেশ্যে বালকের কর্ণবেধের কথা আছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে একটি কর্মচঞ্চল গহনার দোকানের ঐ যুগের এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে। শকুন্তলার আংটি, কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের বর্ণিত পুষ্পালঙ্কারের আকর্ষণ আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। দশকুমার চরিত, জাতককাহিনী, বিনয় পীটক, বনের কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে, মাঘের শিশুপালবধে, হর্ষের নৈষধ চরিত্রে, বৃহৎ সংহিতায়, অমর কোষে এবং যাবতীয় পুরাণাদিতে অলঙ্কারের বহুবিধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্যে আদিম সমাজের অনুকরণে কণ্ঠাভরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই আভরণ হৃদয়ের কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। কারণ, হৃদয় ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। হৃদয় রয়েছে গ্রীবাদেশের নিচে, নাভিদেশ থেকে বারো আঙ্গুল ওপরে। পদ্মের মুকুলের মত ঐ হৃদয় নাড়ীগুলো দিয়ে জড়ানো। ঐখানে ছোট একটি ফুটো আছে যার মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

দেবতাদের স্তবগানে তাঁদের রূপ বর্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় (বর্হাপীড়) ময়ূরের পালক দিয়ে শিরশোভনের কথা, (বল্লবীনয়নাম্ভোজ

মালিনে) পদ্মের মালার কথা বলা হয়েছে, শ্রীরামরহস্যে-'শঙ্খভূষণ' উল্লেখিত হয়েছে। চির-কালের ছাইমাখা শিবকে পর্যন্ত রত্ন-আকল্প-উজ্জ্বলং-অঙ্গং, মন্দার-পুষ্প পূজিতায়, রঞ্জিত সং মুকুটং, মঞ্জীর-পাদ যুগলায় ইত্যাদি স্তব করা হয়েছে। দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই যেখানে যত ভালো অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময় বস্ত্র থেকে মুক্তামালা সবকিছু পরিয়ে তবে শান্ত হয়েছেন স্তব রচয়িতা। বলা বাহুল্য, এই বর্ণিত বিবিধ অলঙ্কার স্তোত্রকারের মনগড়া ব্যাপার কিছু নয়।

আমরা সাহিত্যে দেবদেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কারের বর্ণনা পেয়েছি শিল্পশাস্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেই কারণে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য ছাড়া বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অন্যান্য মূল্যবান্ অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত অলঙ্কারে স্থানকালের বিশেষ শৈলী দৃষ্টি এড়ায় না। যেহেতু নির্দেশানুসারে সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অলঙ্কার কোন বিশেষ দেব-দেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মানুষের ব্যবহারের অলঙ্কারেই তার পরিচয় বিধৃত। এ কথা শুধু হিন্দু দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর 'অভিধান চিন্তামণি'তে যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর কথা বলেছেন তাঁদের অঙ্গাভরণ এবং শ্বেতাম্বরী ২৪ শাসনদেবীর অঙ্গাভরণ থেকে সুরু করে বৌদ্ধ অমিতাভকুল, অক্ষোভ্যকুল, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধিকুলের যাবতীয় দেবদেবীর অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জৈন ধনপালের তিলকমঞ্জরী এবং নারদশিল্পের ভৌমিক, ভিত্তি ও প্রস্তরচিত্র আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পর্কিত ধারণার সহায়ক।

ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদের খননলব্ধ অগণিত মূর্তি, খেলনা এমনকি মণিমুক্তা ও অলঙ্কার। যে বাঙলা-দেশের ভূমির প্রাচীনতা সম্পর্কে সে দিন অবধি পণ্ডিতদের দ্বিধার অন্ত ছিল না, আজ অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও যে সব প্রত্নদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভারতীয় অলঙ্কার সম্পর্কিত একটি চিত্র পরিস্ফুট। চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা (২৪ পরগণা), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাসাপাড়া (বীরভূম) থেকে বর্তমান আলোচক শুঙ্গ যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির যক্ষিণী সংগ্রহ করেন। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিতে রত্নজালি, টিকা, পর্যাষ্টক, হেমসূত্র এবং কিরীট কুণ্ডল অতি স্পষ্ট। এ ছাড়া পাওয়া গেছে নানান্ আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিবিধ মাল্যদানা। এর মধ্যে আগেট, কালসিজনীয়, গারনেট, জেস্পার এবং কোয়ার্টজ্-ই পরিমাণে বেশি। হরিনারায়ণপুর এবং দেউলপোতায় পাওয়া গিয়েছিল অগণিত পোড়ামাটির মাল্যদানা যার বড়গুলিকে মাছের জালে ব্যবহারের গুটি বলে মনে হয়।

ভারতীয় নারীমূর্তির প্রাচীনতম নমুনা ঝোব ও কুল্লীর দগ্ধমৃত্তিকা থেকে সুরু করে প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি আকর অলঙ্কারের (যুগে যুগে তার অভিধান্তর

ঘটলেও) কথা জানতে পারি। ১। রত্নজালি অর্থাৎ রত্নখচিত কেশ আবরক ২। কিরীট-কুণ্ডল অর্থাৎ শিরোভূষণ ৩। হেমসূত্র অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ ৪। জনপদবধূর করশোভা বলয় ও অঙ্গুলীয়ক ৫। হেমমেখলা ও কিঙ্কিণী, সজ্জিতা ললনার কটিবন্ধ ৬। নাগরিকার পদাভরণ নূপুর।

শিল্পশাস্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে বিভাজন আছে তদনুসারে বিবিধ অলঙ্কার যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিসিদ্ধভাবে এইরকম ভাগ করা হয়েছে। মস্তক থেকে কণ্ঠ ঃ শিরোরত্ন, ললাটিকা, তাড়ঙ্ক, মুক্তামালা, গ্রৈবেয় ও উর্মিকা। কণ্ঠ থেকে কটি বা নাভিদেশ ঃ প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তংস ও ঋক্ষমালিকা। পার্শ্ব ও হস্তালঙ্কার ঃ পার্শ্বোদ্যত, নখোদ্যত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাভূষণ ও অঙ্গিকা। কটিদেশের অলঙ্কার ঃ ভ্রাস, প্রাগগুবন্ধ, নাভিপূর, নাভিমালিকা। এ ছাড়া মাণবক, ললন্তিকা, কটিলগ্ন ও উধ্বর্তারার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে শৃঙ্খল ব্যবহৃত হত। সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কার ঃ কাঞ্চী, অষ্টযষ্টিকা, রসনা ও কলাপ।

॥ চার ॥

সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ভারত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশলের মানে, দক্ষতায়, গঠনবৈচিত্র্যে ও উপাদানব্যাপ্তিতে বিশ্বের সেরা দেশগুলির অন্যতম ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ, খোদাই, ঠোকাই, ছাঁচঢালাই প্রভৃতিতে দক্ষতা, জালি কাজ, ঠাণ্ডা পাথরবসানো কাজ, রঙীন উজ্জ্বল কাচের কাজ, রঙ ঢেলে এনামেলের কাজ, পুঁতি ছেঁদা করার কাজ—সব ব্যাপারেই আশ্চর্য অগ্রগতি চোখে পড়ে। আর্যরা ধাতুর ব্যবহারেই সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, স্বর্ণ ও কখনো কখনো রৌপ্য ব্যবহার করে বিবিধ অলঙ্কার নির্মাণ করতেন তাঁরা। তক্ষশীলা থেকে উদ্ধার করা অলঙ্কারে গ্রীক ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত গঠনবৈচিত্র্য ও নকশার যে পারিপাট্য দেখা যায়, তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সোনার সূক্ষ্ম জালি কাজ ও অত্যুন্নত এনামেলিংয়ের জন্য তক্ষশীলা খ্যাত। মৌর্যযুগে প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারী গহনাও এল, আর দেখা দিল সোনারুপোর বাসনকোসন এবং রাজার হাতির অঙ্গে সোনা রুপোর অঙ্গাভরণ। ভারতবর্ষের সমাজ আর্থনীতিক যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসের প্রত্যেকটি মোড় ঘোরার সঙ্গে ছোটবড় রাষ্ট্রযন্ত্র ও ব্যক্তিক অভিরুচি নতুন নতুন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণের পর গুপ্তযুগ মোহনমালার ব্যবহারে যেন ঝলমল করে উঠেছিল। পূর্বের তুলনায় আয়তনে বড় হলেও গুপ্তযুগীয় অলঙ্কার ছিল ওজনে হাল্কা, বৃহদায়তনের উপযোগী জটিল নকশায় সমৃদ্ধ এবং সব মিলিয়ে অনেক বেশি মার্জিত।

গুপ্তযুগ ও মুসলমান যুগের মধ্যবর্তীকালে এই শিল্পটি অলঙ্করণ প্রাচুর্য ও তক্ষণাদি কৌশলে মার্জিত সূক্ষ্মতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মানসাম্য লাভ করেছিল যাকে প্রকারান্তরে অগ্রগতির দিক থেকে অচলাবস্থা বলা চলে। আসলে, ভাবসমৃদ্ধ গুপ্তযুগের

পর থেকে কারু ও শিল্পের রাজ্যে এক বদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছিল। অলঙ্কারশিল্প ইতিপূর্বে নকশা, পরিকল্পনা ও রূপায়নে শ্লাঘনীয় পরিণতি লাভ করলেও, এই অন্ধকার যুগে অলঙ্কারশিল্পে গণরুচিকে যা নিয়ন্ত্রিত করত তা বিশুদ্ধ শিল্পস্পৃহা নয়, পরন্তু অলঙ্কার-সমূহের বিবিধ আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ও ধর্মীয় সংস্কার, কখনো বা তাদের নিছক ঐশ্বর্যমূল্য। মুসলমান আক্রমণের ফলে এই অচলায়তন ভাঙতে সুরু করে এবং ক্রমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পরিণতিস্বরূপ অলঙ্কার শিল্পেও যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সমন্বয়-প্রক্রিয়া চরম সার্থকতা লাভ করে মুঘল আমলে এবং এর মূলে কাজ করেছিল আরবীয় নয়, পারসিক বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যরুচি, কারণ অভিজাত শাসককুল তখন পারসিক আদর্শে মগ্ন ছিলেন।

প্রাক্-মুঘল যুগের তুর্কি অধিপতিদের কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজসভায় ঠাঁঠ-ঠমক ও আড়ম্বর হয়ত কম ছিল না, কিন্তু মুঘলযুগের অলঙ্কারের অভিজাত মনোভঙ্গী, চরমোৎকর্ষপরায়ণতা, রুচিসৌকুমার্য, গীতিময় সৌন্দর্যপ্রেম ও নিটোল দীপ্তির পাশে পাঠান বিত্তবত্তার নগ্ন প্রদর্শন অনেক ঠুনকো ও নিষ্প্রভ বোধ হয়। পাঠান যুগের কারুকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা বিবরণে। 'ভোজসভা শেষ হলে রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটি, সোনার কটিবন্ধ, সোনার কুঁজো আর সোনার পেয়ালা উপহার দেওয়া হল। সহকারীরা ঐ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব রূপোর তৈরী।'...'তারা পায়ে দেয় সোনালী জরীর কাজ করা চটি।...কানেতে তারা দামী পাথর বসানো সোনার দুল পরে। তাদের গলায় দোলে হার।... হাতের কব্জী এবং পায়ের গোড়ালিতে তারা সোনার বালা ও মল পরে, হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরে।' গৌড়েশ্বর বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রাজমুকুট' উপাধি দেবার সময় 'তাঁকে উজ্জ্বল মণিময় সুন্দর হার দ্যুতিমান দুটি কুণ্ডল রত্নখচিত দশ আঙ্গুলের রতনচূড় দিয়েছিলেন।' বৃন্দাবন দাসের দৃষ্টিতে, 'কেবল নারীরা নয়, পুরুষেরাও নানারকম অলঙ্কার পরতেন, যেমন—অঙ্গবলয়, আংটি, নূপুর, কুণ্ডল; এইসব গয়না সোনায় তৈরি হত, তার সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।' [সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পরিশিষ্ট]

॥ পাঁচ ॥

বস্তুত আজ অধিকাংশ ম্যুজিয়ামের অলঙ্কার-সম্বল হল মুঘল অঙ্গাভরণ। এখানে আমাদের প্রাচীন ধারা পারসিক ধারার সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি করল পরবর্তীকালেও তাকে এতটুকু ম্লান করা যায়নি। পাঠানের পর থেকেই সমরখন্দ ও হীরাটকে আমরা খুব কাছে পেতে থাকি। সৈয়দ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদের নান্দনিক দৃষ্টির একটা বিরাট পরিবর্তন তখন

এসে গেছে। মুঘল বাদশাহের অর্থকৌলীন্যের সঙ্গে পারসিক রুচির বিবাহবন্ধনে আমাদের চোখের বিপ্লব পুরোপুরি ঘটে গেল। ক্ষুদ্র চিত্রের কারিগরীতে, দিল্লী আগ্রার প্রাসাদ হর্ম্যে, সিদি সৈদের জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তারই আরেক দিক মুঘল অলঙ্কার। এ অলঙ্কারে ধাতু ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গঠনশৈলী প্রায় ঐতিহ্যবাহী কিন্তু জড়োয়ার এমন নয়নাভিরাম সমাহার এর আগে পরে কখনো দেখা যায় নি। সর্বোপরি যোগ হল পারসিক মিনাকারি। মুঘলযুগের এই মিনাকারি আমাদের আবহমানকালের অলঙ্কারধারাকে নতুন নতুন পথে চালিত করল। গৌড়ের লোটন মসজিদের মিনাকারি শুধু যে আমাদের অঙ্গাভরণকে চঞ্চল করল তা নয়, এর ঢেউ সাগরপারে গিয়েও পড়ল। প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে সাদা মিনার কাজ ইংলণ্ডে চালু হয়েছিল (জয়পুরেও তা চলছিল) কিন্তু পারসিক রঙদার মিনাকারি রাণী এ্যানকে অস্থির করে তুলল। দেখতে দেখতে রামধনু মিনা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। চিত্রকলায় জয়পুর যেমন গুজরাটি প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক মুঘলগন্ধী হয়েছিল তেমনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কুন্দন-মিনাকারির অঙ্গ থেকে মুঘলগন্ধ আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে।

মুঘল আমলের মূল ধাতু অলঙ্কার কিন্তু এদেশের প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই কারণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মোটিফগুলো প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মন্দিরগাত্রে, দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রীতে ও অন্যান্য হাজারো বস্তুতে প্রতিফলিত তার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। তবু ধর্মীয় অনুশাসনানুসারে যখন শিল্পীকে ফুল-লতা-পাতার কেয়ারির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু চক্রজাতীয় নতুন মোটিফ সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই মোটিফের ঢেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দু মন্দিরেও দেখা গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রীতে। পিতৃপূজার মোটিফ, হাঁটু মোড়া মোটিফ, চক্র মোটিফ এবং নাগ ও ড্রাগন মোটিফের বিচিত্র মিলনে এগুলি জন্ম নিয়েছে।

মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাপ্টা প্রথম ঝলকেই আমাদের চমকিত করেছিল। এই চমক থিতিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধান্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহারে। মাথায় নতুন করে এল চৌক্ক, শিসফুল ও ছোটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি। ছোটদের মাথায় বোড়া এবং অন্যান্যদের শিরমার্গ শোভা পেতে লাগল। কপালে দৌনি বা দমনি, কুটবি, টিকা, চাঁদ, তাওইট, ঝুমর, গুছই, বিন্দলি ও বারওয়াটের প্রচলন হল। কানে উঠল গোসওয়াড়া, বাহাদুরি, ঝুমকা, বালা, খুংরিদার, মছলিয়ান, পতং, তানদুর এবং মোর ফুলওয়ার। নাকের অলঙ্কার নথ, বুলক, লটকান এবং লং একেবারে নতুন বস্তু হিসাবে দেখা দিল। দাঁতের ক্ষেত্রেও রখন অভিনবত্ব আনল। হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, জুগনু, মোহরন, হাউলদিল, হাঁসলি,

গুলুবন্ধ, ইতরাদন, কান্দি, শিলওয়াটা, লরি (পাঁচ, সাত)—অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন অভিধা মাত্র। হাতের গহনায় বাজুবন্ধ, জৌশন, তাওয়িজ, অনন্ত, ভাওট্টা, এলাচি, কম্পন, গোখ্‌রু, কারা, চূড়, গইরা প্রভৃতি আকৃতি ধারানুসারী, তক্ষণকর্মেও পুরনো মোটিফ পর্যন্ত রয়ে গেল। আংটির ক্ষেত্রে সামান্য অভিনবত্ব দেখা গেল ছল্লা ও আরশিতে। কটিদেশে এল পাহ্‌জেব, চঞ্জর, ঘুংরু ও জাঞ্জিরি। ঔরঙ্গজীবের দরবারের চিকিৎসক ভিনিসবাসী মানুচ্চি মুঘল অন্তঃপুরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারের কথাও জানা যায়। শাহজাদীরা চাদরের মত করে গাঁথা মুক্তোর জাল দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। পুরুষেরা অঙ্গাভরণ ব্যবহার থেকে নিরত ছিলেন না। মোহনমালা জড়োয়া বৈচিত্র্যে এ সময়ে এক নতুন রূপ নিয়েছিল। মানুষের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবার এল পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছড়িতে, অস্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোড়ার অঙ্গে ও বেল্টে, পতাকাদণ্ডে, পানপাত্রে, আলবোলায়, ফুলদানি, মুরাট্টা ও পিকদানি প্রভৃতিতে। বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে প্রাচুর্য থেকে এই অলঙ্করণ এসেছে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির তাগিদে নয়।

মুঘল শাসনের অবসানের দিনেও মুঘল প্রভাব অলঙ্কারক্ষেত্র থেকে মুছে যায় নি। দেশীয় রাজারা ঐ ধারা অনুসরণ করেছেন, এঁদের পৃষ্ঠপোষণায় জয়পুর ও বারাণসীতে নতুন করে কুন্দন ও গুলাবী শিল্পদক্ষতার চরমে উঠেছে। সামন্তরাজা ও জমিদারশ্রেণী কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান করে আঞ্চলিক এক একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন। এই সূত্রে শিল্পীর যে স্থানান্তর ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

পরবর্তীকালে ইংরেজের প্রভাবে ভারতীয় অলঙ্কারের অনেকগুলি সনাতন ধারণা পরিবর্তিত হয়। নতুন গড়ে ওঠা সহরের রুচিতে ভারি ওজনের অলঙ্কার সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ দেখা দেয়। নতুন নাম এক্ষেত্রে যা শোনা গেল তা ঐ আঞ্চলিক মিশ্রণের অবদান। মুঘল চিত্রের আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানার অলঙ্কার এল।

পরিষৎ সংবাদ

অশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন

১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের অশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণের পর সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার মহাশয় গত বৎসরের কার্যবিবরণ, আয়ব্যয় বিবরণ এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয় বিবরণ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থিত করেন।

আলোচনান্তে এই বিবরণগুলি সভায় উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয় (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য)।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৮০তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সংবাদ ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে 'বিশিষ্ট সদস্য' পদে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের নির্বাচন সংবাদও ঘোষিত হয়।

৭৯ বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষার জন্য শ্রীমলয়কুমার দেব ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু মহোদয়গণকে ধন্যবাদ গ্রহণের একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই দুই ভদ্রমহোদয়কে ৮০তম বর্ষের জন্য হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত করা হয়।

এই অধিবেশনে ২১৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

১৩৮০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (ইং ২৪ জুলাই, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পরিষদ মন্দিরের সভাকক্ষ রমেশভবনে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যিক, সুধী ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগী বিদ্বজ্জনের সমাবেশে সভাকক্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই দিবস পরিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বার মঙ্গলকলস, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সভাকক্ষ রমেশভবন ধূপ-ধুনা ও পুষ্প-স্তবকে সুরভিত ও সুসজ্জিত ছিল। এই পুণ্যদিবসে সাহিত্যিক ও পরিষদানুরাগীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহও প্রদর্শিত হয়। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে, "যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা" সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তির দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন বৈষ্ণবসাহিত্যাচার্য ডক্টর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলাচরণান্তে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পরিষদের অতীত স্মৃতিচারণ করেন এবং পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অতঃপর পরিষদ কর্তৃক পুনঃ প্রবর্তিত সাহিত্য বিষয়ক রচনার জন্য পুরস্কারগুলির প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল তন্মধ্যে বিচারকগণের বিবেচনায় যে সব প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সেই সমস্ত প্রবন্ধের লেখকগণকে সভাপতি মহাশয় পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন এবং এই সূত্রে তিনি *বলেন যে এই সমস্ত সাহিত্য পুরস্কার সমূহের প্রদান দীর্ঘকাল হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।* বর্তমান বৎসর হইতে পুরস্কারগুলির পুনঃপ্রবর্তনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

পুরস্কার ও পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণের নাম

১। **হেমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার**

বিষয়ঃ হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ

লেখকঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। **অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি পুরস্কার**

বিষয়ঃ বাংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল

লেখকঃ শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

৩। **স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি পুরস্কার**

বিষয়ঃ বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিরূপমা দেবী

লেখিকাঃ শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

৪। **লীলাদেবী স্মৃতি পুরস্কার**

বিষয়ঃ কবি কামিনী রায়

লেখিকাঃ শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কোষ গ্রন্থ (Encyclopaedia) 'ভারতকোষ' ৫ম খণ্ড, প্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার অগ্রজপ্রতিম বরেণ্য ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের হস্তে 'ভারতকোষ' ৫ম খণ্ডের, প্রথম গ্রন্থখানি পরিষদের পক্ষ হইতে তুলিয়া দেন। সমবেত সুধীবৃন্দ এই সময়ে হর্ষধ্বনি করেন। শ্রীমজুমদার ভারতকোষের ৫ম খণ্ড প্রকাশের সংবাদকেই এই উৎসব দিবসের সুসংবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড আর প্রকাশিত হইবেনা সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও পরিষদের মন্থর কর্মপন্থায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভারতকোষের ৫ম খণ্ড, তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন, আজ 'ভারতকোষের' আরব্ধ কার্য শেষ হইল, ইহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যে

ভারতকোষ ৫ম খণ্ডের প্রকাশ সম্পন্ন হয়। এই কৃতিত্বের জন্য আচার্য শ্রীমজুমদার শ্রীমদনমোহন কুমারের প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে আচার্য শ্রীমজুমদার পরিষদের পুনরুজ্জীবন লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন প্রতিষ্ঠা উৎসবে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভারতকোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করিয়া পরিষদ একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য পালন করিলেন। ডঃ সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতকোষে কিছু প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ স্থান পায় নাই সেজন্য ভারতকোষের পরিপুরক আর একখানি খণ্ড প্রকাশের জন্য তিনি পরিষদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা উৎসবের সভাপতিরূপে, তাঁহার লিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বাঙ্গালাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গালার আলোচনা ও উন্নতিবিধান, বাঙ্গলা সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনুশীলন ও পরিপোষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন। বাঙ্গালা ভাষাচর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলার ও নিয়মানুবর্তিতার বিরোধী শক্তি কাজ করিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং ইহার প্রতিবিধানকল্পে পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের কথাও একাশীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাইয়া দেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন বিগত বৎসরে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইয়াও পরিষদ যেটুকু করিতে পারিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। সম্পাদক শ্রীমান মদনমোহন কুমারের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাভাবে পরিষদ্-ভবন ও রমেশ-ভবন সংস্কার হয় নাই। বিগত বৎসরের চৈত্রমাসে রমেশ-ভবনের সংস্কার সুসম্পন্ন হয়। অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন যে ভারতকোষের পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ হইবে না। সেই ভারতকোষের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড রামমোহন গ্রন্থাবলী, রাজনারায়ণ বসু (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) এই বৎসর পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৯ম সং) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধপ্রবন্ধ' ও ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'স্মারকগ্রন্থের' মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলনের সঙ্কল্প, গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য পরিষদ আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ৫০০ টাকা) এবং রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ১৫০ টাকা) প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

পরিষদের উন্নয়নে তিনি সাহিত্যানুরাগী সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

পরিশেষে পরিষদ্-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই প্রতিষ্ঠা উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীসুকুমার সেন প্রতিষ্ঠা দিবসের এই উৎসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় এবং পরিষদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় পথ নির্দেশ করায় তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে পরিষদ সম্পাদক বলেন যে অদ্যকার এই পুণ্য দিবসে যাঁহারা পরিষদের স্রষ্টা ও প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও পরিষদের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া, অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, তিনি তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের স্বপ্ন আমাদের মধ্য দিয়া সফল হইয়া উঠুক।

বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও উন্নয়নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান

(আকাশবাণী, কলিকাতা কেন্দ্রের আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ৪ শ্রাবণ ১৩৮০ (২০ জুলাই ১৯৭৩) তারিখে প্রচারিত সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের বেতার-ভাষণ)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার আশী বৎসর পূর্ণ হ'ল। ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জুলাই ১৯৭৩) পরিষদের একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস। বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলার সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গত আশী বছরের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৮০ বছর আগে বাঙলার মনীষীরা পরিষদের উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন—"বিবিধ উপায়ে বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিসাধন।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা ৭টি উপায় নির্দিষ্ট করেছিলেন :—

(১) বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন।

(২) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষা সংকলন।

(৩) প্রাচীন, পুঁথি ও অন্যান্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(৪) প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও তার ফল প্রকাশ।

(৫) ভাষান্তর থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ

(৬) বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখার আলোচনা ও সে সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশ।

(৭) 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' নামে বাংলাভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ।

গত ৮০ বছর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পরিষদ্ কাজ করেছে। খুব সংক্ষেপে এক এক করে সেগুলি উল্লেখ করছি।

বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের কাজ পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করেন। পরিষদ্ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই তাঁদের সংগৃহীত উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সতীশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ মনীষীগণ তাঁদের সংগৃহীত উপকরণ পরবর্তী বংশধরদের জন্য পরিষৎ পত্রিকায় রেখে গেছেন। কটক র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনার অবসর সময়ে যোগেশচন্দ্র রায় দীর্ঘ ১৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বাঙলা ভাষার যে ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন পরিষদ্ ১৩২০ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন। বর্তমানে সে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। গত ৬০ বছরে ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা ও বাঙলা ভাষার বহু-বিচিত্র বিকাশের ফলে বাঙলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার সঙ্কল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রহণ করেছেন। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, বাঙলার সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক সমস্ত শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগের কালানুক্রমিক নিদর্শন সেই অভিধানে থাকবে। 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারী যেমন ইংরেজী ভাষার সর্বজন-স্বীকৃত আদর্শ অভিধান পরিষদ্-সম্পাদিত অভিধানও তেমনি বাঙলাভাষার সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ অভিধান হবে।

পরিভাষা সংকলনের কাজের গোড়াপত্তন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। ৮০ বৎসর পূর্বেই পরিষদ্ একাজে উদ্যোগী' হয়েছিলেন। পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষাগুলি পরবর্তী পরিভাষা-রচয়িতাদের উপকরণ জুগিয়েছে।

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, পরিষদের কর্মী ও সদস্যেরা ৮০ বছর পূর্বে শুরু করায় বহু দুর্লভ লুপ্তপ্রায় পুথি রক্ষা পেয়েছে। প্রায় ৭ হাজার প্রাচীন পুথি পরিষদ্ সংগ্রহ করেছেন। এগুলির থেকে বাছাই করে বহু মূল্যবান পুথি প্রকাশ করা হয়েছে। পরিষদ্ প্রকাশিত চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে সাহায্য করেছে। সংগৃহীত সমস্ত পুথি মাইক্রোফিল্ম ক'রে না রাখলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল কালক্রমে নষ্ট হবে। এ-কাজ সরকারের সহায়তায় সম্ভব হ'তে পারে।

পরিষদের মিউজিয়মে বাংলা তথা ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে যে সব প্রত্নবস্তু, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ধাতুমূর্তি, প্রস্তরমূর্তি, পোড়ামাটির কাজ, বিচিত্র শিল্পকর্ম রাখা হয়েছে তা অমূল্য। বাংলার মনীষীদের অনেকেরই ব্যবহৃত

ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, সাজপোষাক, পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি ইত্যাদি পরিষদ্ সযত্নে রক্ষা করছে। পরিষৎ পত্রিকায় এগুলির পরিচয় প্রকাশ করা ছাড়াও পরিষদ্ প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত ৩ খানি গ্রন্থে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় আছে। এগুলির সচিত্র বর্ণনাত্মক একখানি পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

ভাষান্তর থেকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পরিষদ প্রকাশ করেছেন। বিনয়কুমার সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সুধাকান্ত দে প্রভৃতি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ আলোচনা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থপ্রকাশ পরিষদ্ ৮০ বছর ধ'রে করে আসছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক 'ক্লাসিক্স'-এর পরিষদ্-সংস্করণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হবে পরিষদের কার্যারম্ভেই তা নির্ণীত হয়েছিল। বাঙলার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু নূতন তত্ত্ব ও তথ্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি অতীতে গবেষকদের উপকরণ জুগিয়েছে, ভবিষ্যতেও জোগাবে।

সর্বশেষে একটি শুভ সংবাদ। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরিষদ্ বাঙলাভাষায় একখানি বিরাট কোষগ্রন্থ বা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া—ভারতকোষ' চার খণ্ডে প্রকাশের সংকল্প করেন। বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য ৪ খণ্ডে 'ভারতকোষ' সম্পূর্ণ করা যায় নি। ১৪ বছর ধৈর্যসহকারে পরিশ্রমের পর আজ ভারতকোষের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রণ শেষ হল। মঙ্গলবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জুলাই) পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতকোষের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে।

বাঙলার মনীষীদের পাদস্পর্শপূত, বাঙলার প্রাচীনতম সারস্বত প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যে অমূল্য সম্পদ পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশালা, পুথিশালা ও প্রত্নশালায় সঞ্চয় করে গেছেন তার সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। সেই পবিত্র রিক্‌থ রক্ষা করার দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করতে হবে।

৮০তম বর্ষের বিভিন্ন শাখা সমিতি

সাহিত্য

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

দর্শন

ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

বিজ্ঞান

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীচারুচন্দ্র হোম, শ্রীউষা সেন, শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য, শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যচরণ লাহা, ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ইতিহাস

ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীনির্মল সিংহ (চেতলা)।

অর্থনীতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সভাপতি)

সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীকানাইচন্দ্র পাল, শ্রীজ্ঞানশংকর সিংহ, শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীকিরণশংকর সিংহ।

৮০তম বর্ষের বিভিন্ন উপ-সমিতি

ছাপাখানা

শ্রীজ্ঞানশংকর সিংহ, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুস্তক প্রকাশ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীমদন-মোহন কুমার, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীত্রিদিবেশ বসু, শ্রীঅমিয়কুমার সেন শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীঅতীশ সিংহ, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

গ্রন্থশালা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল।

চিত্রশালা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনির্মল সিংহ, শ্রীসুনীল সিংহরায়, শ্রীকমল-কুমার ঘটক, শ্রীসুধীররঞ্জন দাস।

আয়ব্যয়

শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণশংকর সিংহ, শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীগৌরলাল দত্ত, শ্রীকমলকুমার ঘটক।

———

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ক্রোড়পত্র

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা [বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনীকোষ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে সকল স্মরণীয় সাহিত্যসাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থপরিচয়। রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত।]

সুদৃশ্য কাপড়ের বাঁধাই। মোট ১১ খণ্ড একত্রে মূল্য ১০০'০০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সম্বন্ধে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন

'...মালাকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও সমাহরণ নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি।...তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। তাঁহার সোনার দোয়াত-কলম হউক।'

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ।

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) ॥

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত

৯ম সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) ॥

স্মারক-গ্রন্থ

পরিষদের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসবে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা হইতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন।

মূল্য—পনের টাকা মাত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ঊনাশীতিতম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৯তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৯তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে যে-সকল সাহিত্য-সেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পরিষদের ৭৯তম বর্ষের সভাপতি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর পরলোক গমনে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও পরিষদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মনীষী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, কবি নিশিকান্ত, উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক দীপক চৌধুরী (নীহাররঞ্জন ঘোষাল), ঐতিহাসিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, কথাসাহিত্যিক সমুদ্ধ (অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত), কবি কৃষ্ণধন দে, পরিষদের ভূতপূর্ব সহঃসম্পাদক সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সদস্য নরসিংহদাস আগরওয়ালা, সাধারণ সদস্য করুণাকুমার হাজরা ও মৃগাঙ্কমৌলি বসু আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন।

দেশবন্ধু-তনয়া অপর্ণা দেবী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। রোগশয্যালগ্ন দেহে পরিষদ-কর্তৃক প্রেরিত মনোহরশাহী, গড়েরহাটী, রেনেটী ও ঝাড়খণ্ডী রীতির পদাবলী-কীর্তনের একখানি পাণ্ডুলিপি অশেষ পরিশ্রম সহকারে তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

আর্থিক অবস্থা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। দীর্ঘ কাল পরে এই বৎসর পরিষদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। সুখের বিষয় পরিষদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও পরিষদের বেতনভুক্ কর্মীদের দুই দফা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিষদের আর্থিক অবস্থার কথা সদস্যগণের সুবিদিত। গত কয়েক বৎসর পরিষদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল। ফলে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল হইতে কর্জের পরিমাণ ৬০,২০০ টাকা ৬৭ পয়সা দাঁড়ায়। গচ্ছিত তহবিলের এই টাকা পূরণ করা

পরিষদের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত অর্থে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে একদফা ২৫,০০০ টাকা এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্দের প্রথমে একদফা ২৫,০০০ টাকা মোট ৫০,০০০ টাকা গচ্ছিত তহবিল পূরণ করা হইয়াছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা-সচিব ও অর্থ-সচিবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অবশিষ্ট ১০,২০০ টাকা ৬৭ পয়সা পরিষদকে নিজ চেষ্টায় ঋণ শোধ করিতে হইবে। আমরা ইতিমধ্যে গচ্ছিত তহবিলে ৯৫০ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঋণশোধের জন্য পরিষদ-সদস্য ও জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করি। আয়বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচ দ্বারা আমরা পূর্ব্ব পুরুষদের ন্যাস ও গচ্ছিত তহবিল অটুট রাখিতে পারিব আশা করি।

গৃহ-সংস্কার

দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাভাবে পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবন সংস্কার করা যায় নাই। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কার্য্যে সহায়তার জন্য বাংলার ছাত্র-সমাজের নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শ্রম প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ রমেশ-ভবনের সভাকক্ষ এবং পরিষদের বিভিন্ন অংশের সংস্কারের কার্য্যে শ্রমদান করেন। পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবনের সংস্কারে প্রয়োজনীয় উপকরণ শ্রম ও অর্থ দানের জন্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও পরিষৎ-সম্পাদক বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সংবাদপত্র ও বেতার মারফৎ আবেদন করেন। সুখের বিষয়, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী বহু ব্যক্তির নিকট হইতে এই আবেদনে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। জন-সাধারণ ও পরিষৎ-সভ্যগণের দানে এবং সরকারী সহায়তায় আগামী বর্ষে পরিষদ্-ভবন ও রমেশ-ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নকার্য্য সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করি। পরিষদের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুথিশালার জন্য বর্ত্তমান পরিষদ্-ভবনের উপর তৃতীয় তল নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষদের প্রাচীন পুথি পট ও চিত্র, দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীষীদের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য ত্রিতলে অন্তত একখানি বাতানুকূল (এয়ার কণ্ডিশণ্ড) কক্ষ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্য্যনির্বাহক-সমিতির ১৪টি অধিবেশন হইয়াছে। ৭৯তম বৎসরের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লিখিত হইল।

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল।

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

১। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও ভেরা নোভিকোভার স্মৃতিসভা : (২৪ আষাঢ় ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বক্তা : সর্বশ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ত্রিদিবনাথ রায়

২। ইউরোপে পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য প্রদর্শন : (৩০ আষাঢ় ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

৩। অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস : (৮ শ্রাবণ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীসুকুমার সেন
প্রধান অতিথি : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন
বক্তা : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীমদনমোহন কুমার

৪। শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব : (৩০ শ্রাবণ ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রী নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রী ত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীমদনমোহন কুমার

৫। শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা সভা : (১ ভাদ্র ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীধীরাজ বসু

৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব : (৩০ ভাদ্র ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীসুকুমার সেন
বক্তা : শ্রীমনোজ বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৭। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর স্মৃতিসভা : (১১ কার্ত্তিক ১৩৭৯)
সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
বক্তা : শ্রীশৈবাল গুপ্ত, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার

৮। কবি শশাঙ্কমোহন সেন জন্মশতবার্ষিকী : (৮ পৌষ ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন, শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

৯। কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী : (৭ মাঘ ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১০। নূতন ন্যাসরক্ষক-সমিতি নির্বাচন : (১৭ মাঘ ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১১। ৮০তম বর্ষের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচনে ভোট পরীক্ষক নির্বাচন : (১৮ চৈত্র ১৩৭৯)

১২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী : (১৮ চৈত্র ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : সর্বশ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্য আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি ও রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি প্রবর্ত্তন : (২৬ বৈশাখ, ১৩৮০)

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

১৪। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব : (২৬ বৈশাখ ১৩৮০)

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধপাঠ : সর্বশ্রী সুকুমার সেন, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বক্তা : সর্বশ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সঙ্গীত পরিবেশন : বৈতানিক-শিল্পী-গোষ্ঠী (শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নির্বাচিত সঙ্গীতাঞ্জলি)।

১৫। মাইকেল মধুসূদনের তিরোধান শতবার্ষিকী : (১৪ আষাঢ় ১৩৮০)

স্থান : মধুসূদনের সমাধিপ্রাঙ্গণ

বক্তা : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

১৬। বঙ্কিম-জন্মোৎসব : (১৬ আষাঢ় ১৩৮০)

সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রবন্ধপাঠ : (১) বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা : শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কবিতাপাঠ : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বক্তা : সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন ভুঞা, মদনমোহন কুমার

পুস্তক-মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে

১। বাংলা সাময়িক পত্র ১ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড

৩। রাজনারায়ণ বসু (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতকোষ

ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় ও শেষ কিস্তির ৪৬.০০০ ছেচল্লিশ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মাধ্যমে ১৯ আষাঢ় ১৩৮০ (৪ জুলাই ১৯৭৩) ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থপ্রাপ্তির পর ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণ কার্য্য দ্রুত শেষ করা সম্ভব হইয়াছে। অচিরেই ভারতকোষ প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-কমিশনার ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকুমার গুহ ও শিক্ষা-অধিকর্তা অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন করকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্মারক-গ্রন্থ

৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থ শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডে মুদ্রিত হইতেছে। উহার মুদ্রণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে উনাশীতিতম বর্ষের (১-৪ সংখ্যা) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

একসপ্ততিতম বর্ষের (১৩৭১) পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় উহাও আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

অশীতিতম বর্ষ (১৩৮০) হইতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পুনরায় ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে। অর্থাভাবে দীর্ঘ কাল পরিষৎ-পত্রিকা ত্রৈমাসিক স্থলে বার্ষিক রূপে প্রকাশিত হইতেছিল। অশীতিতম বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৩৮০ বৈশাখ—আষাঢ়) মুদ্রিত হইয়াছে। অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ পুথিশালায় ২৮৯৬ খানি বাংলা পুথি মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। দুইখানি বাংলা পুথি পাওয়া যায় নাই—(১) ৭৬৯ নং পুথি (কাশীরাম দাসের মহাভারত

—বনপর্ব), (২) ২৫৬ নং পুথি (সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল, আখড়া ও ফলানির্মাণ পালা)। ৭৬৯ নং পুথি কাশীরাম দাসের মহাভারত বনপর্ব পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ তারিখে পুথিশালার তৎকালীন কর্মী ৺তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য পরিষৎ-কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন।

পরিষদ্ পুথিশালায় রক্ষিত ২৭৩ খানি সংস্কৃত পুথি মিলান হইয়াছে। ১ খানি পুথি ৭৫৭ নং পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীমদনমোহন কুমারের অভিযোগ-ক্রমে পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি তদন্ত করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৫৪ খানি বাংলা পুথি ও ২৮৫ খানি সংস্কৃত পুথির তালিকা করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে মোট ৪০ খানি পুথি ৭ জন গবেষক ব্যবহার করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার সর্বপ্রকার পুথির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ৬৭২২। ইহাদের বিষয় ভাগ নিম্নরূপ: বাংলা ৩৫৩৯ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ৩০৫০ + ৪৮৯), সংস্কৃত ২৯২৬ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ২২৭৩ + ৬৫৩), তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩। বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে বাংলা পুথি : চিত্তরঞ্জন—৪১১, রামেন্দ্রসুন্দর—২১ এবং গোপালদাস চৌধুরী —৫৭ এবং সংস্কৃত পুথি : চিত্তরঞ্জন—১৩, রামেন্দ্রসুন্দর—৬০, গোপালদাস চৌধুরী—২৫৬, বিদ্যাসাগর—৩২৪।

পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি

পরিষদের ৭৮তম বর্ষের সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট লিখিত ১৯শে মে ১৯৭২ তারিখের পত্রে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরিষদের চিত্রশালা পুথিশালা প্রভৃতি যথোচিতভাবে সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে ৭৮তম বর্ষের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ (১১ জুন ১৯৭২) তারিখের সভায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীদিলীপকুমার মিত্র সদস্যগণকে লইয়া 'পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি' গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্নবস্তু এবং গ্রন্থাগারের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ সংগ্রহের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া পরিষদের কি কি সম্পদ স্থানান্তরিত অথবা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যবহৃত অথবা অপহৃত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিয়া যথাসত্বর কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত তদন্তকমিটি অদ্যাবধি তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি, কাগজপত্র ও কার্য্য-বিবরণ পুনঃপুনঃ অনুরোধসত্ত্বেও কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট দাখিল করেন নাই।

নূতন ন্যাসরক্ষক-সমিতি

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিষদের ন্যাসরক্ষক-সমিতির কোনও সভা আহূত হইত না। ন্যাসরক্ষক শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী নিয়মাবলী অনুসারে অবসর গ্রহণ করায়, ন্যাসরক্ষক লীলামোহন সিংহ রায় ও নির্মলকুমার বসু পরলোকগমন করায় এবং ন্যাসরক্ষক শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী পদত্যাগ করায় ন্যাসরক্ষক-সমিতি কার্য্যকর ছিল না। যাবতীয় স্থাবর ও নিয়মাবলীর তপশীলভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের মালিকানা ন্যাসরক্ষক-সমিতিতে বর্ত্তানয় পরিষদের সম্পদাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যাসরক্ষক-সমিতি নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় পরিষদের নূতন ন্যাসরক্ষকসমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

রামকমল সিংহ স্মৃতিরক্ষা সমিতি

পরিষদের ভূতপূর্ব কর্মী ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক রামকমল সিংহের স্মৃতিরক্ষার জন্য গঠিত কমিটি তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও সাধারণের নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে ২৫,০০০ টাকা দান সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি ও রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি

দানবীর মতিলাল শীলের দৌহিত্র-বংশীয় শ্রীকালিদাস মল্লিক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'কালিদাস মল্লিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট' হইতে মাসিক ৫০০ টাকার অনুদান আরতি মল্লিক গবেষণাবৃত্তি প্রবর্ত্তনের জন্য রেজেষ্ট্রীকৃত ট্রাষ্ট ডীডের দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুকূলে অর্পণ করিয়াছেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি' নামে আলোচ্য বর্ষে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি' নামে মাসিক ১৫০ টাকার একটি গবেষণা-বৃত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

যাঁহাদের দানে ও বদান্যতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইল তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

স্মৃতি-পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে 'হেমচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার', 'অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-পুরস্কার', 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার' ও 'লীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার' পুনঃপ্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

'হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ', 'বাংলা কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল', 'বাংলা কথাসাহিত্যে নিরুপমা দেবী' ও 'কবি কামিনী রায়' বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য যথাক্রমে উক্ত পুরস্কারগুলি পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে অদ্য ৮ শ্রাবণ দেওয়া হইবে।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কার্য্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থশালা মোট ২৬৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯,০৯৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৪.৩২ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন (পূর্ব্ব বৎসর ২৯.১০ জন গড়ে দৈনিক উপস্থিত ছিলেন)। ইহার মধ্যে লেন-দেন-বিভাগে ২৬৫ দিন কাজ হয় এবং ৪,৪২৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬.৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর ইহার দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪.৬০ জন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৫ দিন কাজ হয় এবং ৪,৬৭০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৭.৬০ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব বৎসর ইহার দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪.৫০ জন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে সর্ব্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১ ও ৩০ জন। ইহা ছাড়া এ বৎসর সদস্য নহেন এমন ৪২ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা মোট ১৪৯ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন।

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৮,২০৪ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬৮.৬০ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন-পত্রকের সাহায্যে ৭০৪৪ (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬.৫০) ও পাঠকক্ষে ১১,১৬০ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪২.১০ খানি) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। পূর্ব্ব বৎসর গড়ে দৈনিক ৪০.৫ খানি পুস্তকের লেন-দেন হইয়াছিল। বিষয়-অনুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেওয়া হইল।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (ইনডেক্সড্) পুস্তকতালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাও আলোচ্য বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (Fumigation chamber-এ) এ বৎসর ৩০২ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে। অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থাভাববশতঃ বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ১,০২৮ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আনুমানিক মূল্য ৪,২৪০.২০ টাকা। যাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষদ্ বাঙলা অভিধান

আশী বৎসর পূর্বে বাঙলার মনীষীরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন : "বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিসাধন।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সাতটি উপায় তাঁহারা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহার প্রথমটি হইল "বাঙ্গলা ভাষাব ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।" ১৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরিষৎ কর্তৃক দুই খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হয়। ৬৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত সেই অভিধান বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার কাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। সাধু, চলিত, আঞ্চলিক সমস্ত বাঙলা শব্দের অর্থ, যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি, সাহিত্যিক ও মৌখিক প্রয়োগের কালানুক্রমিক নিদর্শন এই অভিধানে থাকিবে। এই কার্যে প্রভূত শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এই বিরাট কার্যে বাঙ্গলার প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই) Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই "বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক" এবং "অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা হয়" বলিয়া Academy নামটি পরিবর্তন করিয়া "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" করা হইয়াছিল।

Bengal Academy of Literature-এর প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ শ্রাবণ তারিখেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব বরাবর পালিত হইত। কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্মরণীয় পুণ্য দিবসটি আমরা পালন করি নাই, প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণ করি নাই। আলোচ্য বর্ষে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত আমরা যথা শক্তি পালন করিয়াছি এবং প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবের পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছি।

অদ্যকার এই পুণ্য দিবসে, যাঁহারা পরিষদের স্রষ্টা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, পরিষদের সেবায় যাঁহারা তন্ময় হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, পরিষদের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া, অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহাদের শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, তাঁহাদের স্বপ্ন আমাদের কর্মের মধ্য দিয়া সফল হউক॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৮ শ্রাবণ ১৩৮০॥
২৪ জুলাই ১৯৭৩॥

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পরিশিষ্ট—'ক'

৭৯তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীসুধীর কুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষঃ শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ: শ্রীভবতোষ দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষঃ শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

পুথিশালাধ্যক্ষঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

পত্রিকাধ্যক্ষ: শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ২। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ৪। শ্রীকামিনীকুমার রায় ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৬। শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৭। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচর্যে ৯। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ১০। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩। শ্রীদেবকুমার বসু ১৪। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫। রেভাঃ ফাদার পি. ফালো এস. জে. ১৬। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ ১৭। শ্রীমনোমোহন ঘোষ ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ১৯। শ্রীসন্তোষকুমার বসাক ২০। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শাখা-প্রতিনিধি

১। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর) ২। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)

পরিশিষ্ট—'খ'

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

বান্ধব: রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য: সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ।

আজীবন সদস্য: সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় ইন্দুভূষণ বিদ্, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্জন রায়, সতেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভুভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, ঊষা সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, শিবেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখার্জি, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, দুর্লুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাশ, অরুণকুমার সেন, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ, নরসিংহ দাস আগরওয়ালা।

সাধারণ সদস্য সংখ্যা : ৮৮৭ জন

পরিশিষ্ট—'গ'

পুস্তক আদান প্রদান—১৩৭৯

বিষয়ানুযায়ী

১৩৭৯	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	১০৭	৮৬	১৯৩
ধর্ম (২০০)	২১৩	৪৫৭	৬৭০
সমাজবিজ্ঞান (৩০০)	৫৪	২৪৭	৩০১
শিক্ষা (৩৭০)	৪২	৩৪	৭৬
ভাষা (৪০০)	৪৭	১২০	১৬৭
বিজ্ঞান (৫০০)	১৯	৪৯	৬৮
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	৬	২৬	৩২
শিল্পকলা (৭০০)	২০	৩৭	৫৭
সঙ্গীত (৭৮০)	৭১	৬২	১৩৩
সাহিত্য (৮০০)	৫৭৪৩	৩৭৮৫	৯৫২৮
ভূগোল বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১২	৮৬	২১০
জীবনী (৯২০)	৩৯৫	৭০৮	১১০৩
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১৫৮	৪১৩	৫৭১
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৪৫	৩৯১	৪৩৬
পত্র পত্রিকা		৪৬৫৯	৪৬৫৯
	৭০৪৪	১১১৬০	১৮২০৪

ভাষানুযায়ী

১৩৭৯	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৬৯১৭	১০২৩৯	১৭১৫৬
ইংরাজী	৮৯	৮৭৯	৯৬৮
সংস্কৃত	৩৮	৪০	৭৮
হিন্দী		২	২
	৭০৪৪	১১১৬০	১৮২০৪

পরিশিষ্ট—'ঘ'

মোট পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৭৯)

গ্রন্থাগারে মোট পঞ্জীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা=২,৬৯৬

(১৩৭৮ এ পঞ্জীকৃত পুস্তকের সংখ্যা—৫২০)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

একাশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব

মঙ্গলবার ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জুলাই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সমগ্র মানবজাতি এখন বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ—বঙ্গভাষী জনগণের বাসভূমি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য "পশ্চিমবঙ্গ" এবং স্বাধীন রাষ্ট্র "বাংলা দেশ"-ও—সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা, বিভ্রান্ত, জ্ঞানহীন, আত্মবিস্মৃত এবং চরম দুর্দশার কবলে। মনে হয়, এই অবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে আমরা বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইব। এই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিপজ্জালের মধ্যে জড়িত হইয়া গিয়াছে—আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকের মধ্যে নিহিত প্রতিটি সমস্যা। আধুনিক যুগের জগৎ-জোড়া বিপত্তির প্রধান কারণ হইতেছে, মানুষের সংখ্যার অতিক্রুত ক্রমবর্দ্ধমান স্ফীতি। মাতা ধরণী আর বেশী দিন মানুষের ভার বহন করিতে পারিবেন না—বহু চিন্তাশীল ধীরমতি বিচক্ষণ ব্যক্তি আশঙ্কা করিতেছেন, আর দুই-চারি পুরুষের মধ্যেই একটা কিছু অঘটন ঘটিবে। তাহার নানা লক্ষণ চারিদিকে দেখা দিতেছে। জীবনে দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার, এবং অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও পালটা অত্যাচার ও অবিচার, সমাজে নিষ্ঠুর অন্তর্দ্ব্দ্ব, এ-সব কারণ-ও আছে। এগুলির বিধ্বংসী শক্তিও বাড়িতেছে। জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণে খাদ্যাভাব, জীবন-সংগ্রামে অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা, আপনাকে বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষায় প্রচণ্ড স্বার্থপরতা আনুষঙ্গিক নীতিহীনতা, এখন-ই হাতে-হাতে যাহা পাওয়া যায় সেইরূপ সুখ-সুবিধা লাভের জন্য দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ-চিন্তার কথা একেবারে পরিহার করা—ব্যষ্টিগত বা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা জাতিগত উভয়-বিধ জীবনেই—এই-সবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আর ও অনেক কিছু মিলিয়া আমাদের জীবনে একটা নৈতিক বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়াছে। সুসভ্য সমাজের উপযোগী মূল্য-বোধকে আমাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সমাজের সমস্ত দেহে গলিত ক্ষত আশ্রয় করিয়াছে। ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আভ্যন্তর কথা, আর সব কিছুই বাহ্য।

এই অভাবনীয় অবস্থার কার্য্যকারণাত্মক আলোচনা জাতীয় জীবনে একটি প্রাথমিক আবশ্যক বিষয় হইলে-ও, উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও আমাদের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এবং পরিষদের সমক্ষে স্থাপিত ও রক্ষিত আমাদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা, এখনকার ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণের জীবন-বৃত্তের এবং জীবন-চর্য্যায় সমস্ত অঙ্গের মত, এই নৈতিক বিপর্য্যয় কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, এবং মূল্য-বোধ, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পূর্ণ অভাব এ ক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছে। পরিষদের এই আশী বৎসরের জীবনে, সাম্প্রতিক কালের কয়েক বৎসরের ইতিহাস আমাদের পক্ষে আদৌ গৌরবের পরিচায়ক নহে। সুখের বিষয়, আমাদের কেহ-কেহ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া, আমাদের মধ্য হইতে পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে অমনোযোগ, স্বার্থসিদ্ধির আগ্রহ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীতিহীনতা প্রভৃতি, অধুনাতন কালের অভিশাপ-স্বরূপ এই-সমস্ত অবগুণ বিদূরিত করিয়া দিয়া, আবার যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ জাতির সেবায় তাহার পূর্বকার কৃতিত্ব ও সাফল্য এবং মর্য্যাদা ফিরিয়া পায়, এই দুঃখের দিনেও যাহাতে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক গৌরবের কিছুটার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, সেই জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, পরিষদের হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায়, পরিষদের কতকগুলি কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীর সহযোগিতায়, এবং দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত কতকগুলি ছাত্রের ও ছাত্রীর নিঃস্বার্থ এবং অতন্দ্র শ্রমদানের ফলে, পরিষদ তাহার মুমূর্ষু অবস্থা হইতে এখন একটু সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে। ইহার ছোট-বড় নানা প্রমাণ আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করিতে পারিব, ইহাই পরিষদের বর্তমান পরিচালকদের পক্ষে বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা।

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কিশোর ও তরুণদের মধ্যে এবং তাহাদের পরিচালক ইদানীন্তন কালের বহু শিক্ষকের মধ্যে, যে মানসিক ও সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক অবনতি স্থায়ী আসন করিয়া লইতেছে, তাহা জাতির পক্ষে ভয়াবহ। অলস এবং শ্রমবিমুখ হইয়া ও চিন্তাশীলতা বর্জন করিয়া সকলেই এখন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে, নূতন-নূতন বিচার-ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টার স্থাপনা করিতে ব্যগ্র। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের দোহাই দিয়া (যে অধিকার এখন আর নাই) এই নিত্য-নব-নব মত প্রচারিত হইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ যে কাজে আত্মনিয়োজিত হইয়া যথা-শক্তি এই আশী বছর ধরিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মৌলিক আদর্শগুলির সংরক্ষণে, আমাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক অবনতি, আলস্য ও শ্রমবিমুখতা, শৃঙ্খলা-ভঙ্গের নির্বোধ প্রবৃত্তি ও নূতনত্বের অন্ধ আবাহন—এই-সবে মিলিয়া, নানা প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ আশী বছর পূর্বে যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইয়া ছিল যে, সব দিক্‌ দিয়া বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গলার আলোচনা ও উন্নতি-বিধান, বাঙ্গলা সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন, এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির

অনুশীলন ও পরিপোষণ করাই হইবে পরিষদের কর্তব্য। দেশবাসীর সহায়তায় যথা-জ্ঞান যথা-শক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, এবং এ যাবৎ পরিষদ্ যেটুকু করিতে পারিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। হয়তো তাহা সর্বতো ভাবে গৌরবময় নহে, কিন্তু পরিষদের গবেষণাত্মক, পুস্তক-প্রকাশাত্মক, নির্দেশাত্মক কৃতিত্ব আধুনিক ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে, এবং বহুশঃ অনুকরণীয়ও বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতীতের কথা লইয়া কালক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। বাঙ্গালা ভাষার সেবা, ইহার চর্চা ও উন্নতি-সাধন—এইটিই হইতেছে পরিষদের অন্যতম প্রত্যক্ষ ও মুখ্য কর্তব্য বিষয়। নূতন-নূতন সাহিত্য-সর্জনা, সাহিত্যে কারয়িত্রী প্রতিভার সন্ধান ও তাহার উন্মেষে সহায়তা দান—পরিষদের আর্থিক শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমায়িত বলিয়া, এবং সাহিত্যিক প্রতিভা স্বত-উৎসারিত ঈশ্বরীয় বিভূতি, ইহা কেবল মানুষের উৎসাহ-সাপেক্ষ ও পৃষ্ঠপোষকতা-সঞ্জাত নহে এই কারণেও, প্রত্যক্ষ ভাবে ইহা পরিষদের কর্মক্ষেত্রের বাহিরে—যদিও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে পরিষদের আগ্রহ সদাবিদ্যমান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে আমার ছাত্র-জীবনের অবসানের সময় হইতেই সংযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, এখন হইতে প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর হইয়া গেল। এই সেবা-কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এবং পরোক্ষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীদের ভাবশিষ্য ও অনুগামী হইতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কলেজে পাঠ করিবার সময়ে ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান-সম্মত নবীন আলোচনারীতি অধ্যয়ন করিয়া ও তাহার যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া, বাঙ্গালার মনীষীদের আশীর্বাদ লইয়া, মাতৃভাষার আলোচনাতেও সেই রীতির প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাই হইয়াছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং অনুগামী শিষ্যদের দেশনায় নিয়োজিত আমার সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের মুখ্য প্রেরণা। এই কার্য্যে আমি আশাতীত এবং নিজ যোগ্যতার তুলনায় অধিক উৎসাহ এবং সুযোগ সুবিধা পাইয়াছি। কতকগুলি বিষয়ে নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া আমি পুলকিত হইয়াছি, মনের গভীরে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, এবং ভক্তকবি তুলসীদাসের কথায়, অপূর্ব "স্বান্তঃ সুখ" পাইয়াছি। মাতৃভাষার যৎকিঞ্চিৎ সেবার অধিকারী হইয়া, জীবনের সায়াহ্ন-কালে এই ৮৩ বৎসর বয়সে এখন চারি দিকেই দুঃখ কষ্ট স্বার্থান্ধতা নীতিবোধের অভাব আমাকে পীড়া দিতেছে, জীবনের সার্থকতা যেন আর খুঁজিয়া পাইতেছিনা, এখন প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্ট-ভক্তের কথায় বলিতে চাহি—nunc dimittis servum tuum, Domine, in pace—"এইবার, প্রভু, শান্তিতে তোমার দাসকে বিদায় দাও।"

গীতার কথা আমরা কি ভুলিয়া যাইতেছি? "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—গুরুজনের প্রতি, বিষয়-বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়, এবং "প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন,

সেবয়া”—পূর্বাচার্য্যদের ও পথিকৃৎদের প্রণাম করিয়া, নানাভাবে চতুর্দিক হইতে প্রশ্ন করিয়া, এবং বিদ্যা অর্জনের জন্য সেবা বা পরিশ্রম করিয়া তবে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। আন্তরিক শ্রদ্ধা হারাইতেছি, পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি, নানা প্রকারের রাজনৈতিক মতবাদের বুলি আওড়াইতে শিখিয়াছি—মনে করিতেছি, তুড়ি দিয়া “ফোকটে সব মারিয়া দিব”—বিবেকানন্দের উপদেশ ভুলিয়া যাইতেছি—“চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না।” কোন্ দিক্ সামলাইব?

“ও তোর শিরে কৈল সর্পাঘাত—তুই তাগা বান্ধিবি কোথা?”

“বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্ আপৎকালে হ্যুপস্থিতে”—এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান কার্য্য, বঙ্গ-ভাষার সেবা—সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রসারণ,— ইহা কী করিয়া করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে দুই-একটি কথা এই আপৎকালে নিবেদন করিব।

বাঙ্গলা ভাষার সেবা কল্পে প্রথম কথা—সত্যকার শ্রদ্ধাভাব এই ভাষার সম্বন্ধে না আসিলে, কার্য্যকর কোনও কিছু করা সম্ভবপর হইবে না। উপর-উপর কতকগুলি Slogan বা “নারা” বা “দলীয় নাদ” দিয়া কোনও লাভ নাই। “বাঙ্গালা-ভাষা বাঙ্গলা দেশের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক,”—কেবল এই চীৎকারেই কি প্রার্থিত প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে? কি করিয়া ইহাকে সম্ভবপর করা যাইতে পারে, ইহার অন্তরায় কোথায়, আমাদের-ই বা শক্তির অভাব কোথায়—এ-সব কথা কি ধীর ভাবে বিচার করিব না? খালি ইংরেজি ভাষাকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই—যেমন কতক শিক্ষক-বৃন্দ ব্যক্তিও বলিতেছেন, এবং ছাত্রদের আস্কারা দিতেছেন— কি বাঙ্গলা-ভাষার পক্ষে সর্বার্থ-সিদ্ধি হইবে? একটু এ বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবেন না কি, যে এই যুগে জাতীয় মানসিক জীবনে, মাতৃভাষার এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-রচনার জন্য, Physical Sciences অর্থাৎ “ভৌতিকী বিদ্যা” এবং Human Sciences অর্থাৎ “মানবিকী বিদ্যা”, এই উভয়-বিধ জ্ঞান বা বিদ্যার প্রবর্ধনের জন্য, যাঁহারা এই কাজে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদের পক্ষে এক সঙ্গে ইংরেজি ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাতেই প্রাবীণ্য অর্জন কতটা অপরিহার্য্য? ইংরেজ কবি Richard Lovelace রিচার্ড লভলেস্ তাঁহার প্রণয়িনীকে উদ্দেশ করিয়া যে ভাবটি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

I could not love thee, dear, so much,
Loved I not Honour more—

তাহার আশয় লইয়া বিষয়টির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব প্রণিধান করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, কেবল অজ্ঞান ও অহেতুক ইংরেজি বিদ্বেষ ও সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা চালিত না হইয়া, আমরা মনে প্রাণে বলিতে শিখিব, এবং তদনুসারে কার্য্য করিব—

I could not love thee, my Mother Bengali, so much,
Loved I not English and Sanskrit more.

"হে মাতা বঙ্গ-ভাষা, যদি আমি ইংরেজি আর সংস্কৃতকে তোমার চেয়ে বেশি ভালো না বাসিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এত ভালো বাসিতে পারিতাম না।"

এই কথার অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রণিধান করিতে পারিলে আমরা সহজেই বুঝিব, আমাদের ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও পুষ্টি-সাধনে "অংরেজী হটাও" নীতি এবং "মৃত ভাষা সংস্কৃত বর্জনে কোনও ক্ষতি নাই" এই চিন্তায় কার্য্য করা, কি ভীষণভাবে হানিকর হইবে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে, পরিষদের কর্তব্য বিচার করিতে বসিয়া, আমাদের উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত ও ইংরেজির অপরিহার্য্য আবশ্যকতার বিচার একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এই মনোভাব এবং অন্য নানা প্রকারের মনোভাব আসিয়া দেশে যখন শিক্ষাকে কলুষিত করিতেছে, পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহার দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঔচিত্য আছে বলিয়া মনে করি।

পরিষদের কতকগুলি মহাপ্রাণ হিতৈষীর অনুগ্রহে কিছু মাসিক সাহায্য নিয়মিত ভাবে পাওয়া যাইবে, স্থায়ী আয় হইবে—"আরতি মল্লিক বৃত্তি" মাসিক ৫০০ টাকা, এবং "রামকমল সিংহ বৃত্তি" মাসিক ১৫০ টাকা এই দুইটি মিলিয়া। পরিষদের স্থাপনার সময়েই একটি কার্য্যভার পরিষদ্ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাভাবে সুযোগের অভাবে এই সুদীর্ঘ আশী বছরেও তাহা পরিষদ্ হাতে লইতে পারেন নাই। সেটি হইবে বাঙ্গলা-ভাষার একখানি বিরাট্, সম্পূর্ণাঙ্গ অভিধান—প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক বাঙ্গলার সাহিত্যিক লিখিত এবং আঞ্চলিক কথ্য সব প্রকারের রূপের সম্পূর্ণ শব্দসংগ্রহ। স্বাধীন পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ "বাংলা-দেশে", ভারতান্তর্গত পশ্চিম-বঙ্গে, বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে, যত প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল বা আছে সেগুলির পুরা শব্দ একখানি মহা কোষগ্রন্থে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা হইবে। সাহিত্য হইতে এবং মৌখিক ভাষা হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া, ধারাবাহিক রূপে প্রয়োগও প্রদর্শিত হইবে। এই বিষয়ে আমরা এখন চিন্তা করিতেছি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতেছি। ইহাতে বঙ্গ-ভাষী সমগ্র জনগণের সহযোগিতা আবশ্যক হইবে। যে অর্থ লইয়া আমরা এই বিরাট্ কার্য্যে নামিব, তাহা যথেষ্ট হইবে না। দেশবাসীর ও রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা-ও এই ব্যাপারে অপেক্ষিত। অন্ততঃ ৪/৫ বৎসরের কাজ, উপযুক্ত সম্পাদক-মণ্ডলীর পরিচালনায়, সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ বৃত্তিভুক্ কর্মীদের লইয়া এই কার্য্য করিতে হইবে। আমরা এতদিন পরে, দুরপনেয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গলা-ভাষার নূতন বিশ্বকোষ "ভারতকোষ" গ্রন্থখানির পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া একটি গুরুভার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলাম। "ভারতকোষ" সংক্রান্ত সমস্ত কাজ পুরা হইতে চলিল, এই বার আমরা বাঙ্গলা-ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযুক্ত আর একটি কাজে হাত দিবার আশা করিতেছি।

বাঙ্গলা-ভাষার চর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলার ও নিয়মানুবর্ত্তিতার বিরোধী শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষার সেবক প্রত্যেক সুধীজনের অবহিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পথে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাকে কতকগুলি স্বকপোল-কল্পিত ধারণার বশবর্তী হইয়া ত্যাগ করা ঠিক হইবে না। এই নিয়মানুবর্তিতার বিরোধী প্রচার ও প্রয়োগের ফলে, সাধারণ বঙ্গ-ভাষীর মনে তাহার ভাষা সম্বন্ধে অনাবশ্যক ভাবে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিতেছে। পরিষদ্‌ যদি বঙ্গ-ভাষী জনগণের শ্রেষ্ঠ মনীষার কর্মকেন্দ্র হইবার দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে পরিষদের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য পথ এবং পালনীয় নিয়ম জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য হইবে। পরিষৎ-প্রদর্শিত পন্থা ও নিয়মাবলীর আধার হইবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত বস্তুনিষ্ঠ বিচার ও নিষ্কর্ষ। এ বিষয়ে লঘু ধারণা ও অজ্ঞ চিন্তার অবকাশ নাই।

নিয়মানুবর্তিতার অভাব বাঙ্গালী চরিত্রের একটি বিশেষ দৌর্বল্য। মাতৃভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা নিরঙ্কুশ। তাহার আর একটি কারণ, ভাষার সব রকমের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগ আমরা মানিয়া লইয়াছি। তৎসত্ত্বেও, বিগত ঊনিশের শতকে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ, বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ যে আদর্শ তাঁহাদের রচনায় দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা-ভাষার একটি পরিষ্কার সর্বমান্য রীতি বা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শ বা পদ্ধতি বর্ণ-বিন্যাসে, ব্যাকরণে, বাক্যরীতিতে এবং শব্দ-চয়নে শব্দ-সৃজনে ও শব্দ-প্রয়োগে একটি প্রশস্ত রাজমার্গ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা-ভাষার লিখনে পঠন-পাঠনে এতাবৎ সকলেই একটা দিশা পাইয়াছে, সরল সার্থক চিন্তার ও ভাবপ্রকাশের সহজ উপায় পাইয়াছে। এই সুবুদ্ধি ও সৎচিন্তার পরিপোষক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের দান এই বাঙ্গলা পঠন পাঠন ও লিখনের পরিপাটী বা পদ্ধতি আমরা দায়িত্ববোধহীন ভাবে ধ্বংস করিয়া, জাতির মনের প্রকাশে ও পরিবর্ধনে সদা-সহায়ক তাহার ভাষার ক্ষেত্রে বিচারহীন অরাজকতা আনিতে চাহিতেছি—যাহা সত্য বা হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই কেবল রাজনৈতিক অথবা সামাজিক দলের প্রচারিত এমন কতকগুলি মতবাদের মোহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে একটা বিনীত এবং সুদৃঢ় প্রতিবাদ বাঙ্গালী জাতির সুবুদ্ধি, বিচারশীল ও যুক্তিবাদী সজ্জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কয়টি বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে চাহি :

(১) আধুনিক বাঙ্গলা বানানকে কোনও-কোনও স্থলে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা।

(২) বাঙ্গলায় সাধু-ভাষা বনাম চলিত-ভাষার বিরোধকে নূতন ভাবে আনিয়া, সাধু-ভাষা বর্জনের চেষ্টা।

(৩) বাঙ্গলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থান।

(৪) বাঙ্গলা শব্দের নিরুক্তি বা উৎপত্তি বিচার।

(৫) বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ।

(৬) আধুনিক বাঙ্গলায় অনুবাদ-সাহিত্য।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একে-একে আমার বিনম্র নিবেদন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই একাশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাইয়া রাখিতেছি।

(১) বাঙ্গলা বানানের কথা।

দুইটি মুখ্য বিষয় প্রথমেই বলিয়া রাখিতে চাই— (১) পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নাই যে ভাষার লিপি মুখ্যতঃ তাহার উচ্চারণ প্রকাশের জন্যই গঠিত হইয়াছে, তাহার সেই ধ্বনি-নির্দেশক লিপির বর্ণ-বিন্যাস ভাষাটির উচ্চারণকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। উচ্চারণ ও বানানে একটা অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিয়া যাইবেই। কিন্তু সাধারণতঃ ভাষালেখার কাজে তাহা এমন কছু মারাত্মক ব্যাপার নহে। সেই জন্য, একেবারে কথ্য ভাষার উচ্চারণের প্রতিচ্ছায়া হইবে— কোনও ভাষার লিপি ও বানান, এই রূপ দুরাশা করিয়া, বাঙ্গলা বা অন্য কোনও ভাষার প্রচলিত বানানকে একেবারে অথবা মুখ্যতঃ উলটাইয়া দিয়া "ঢালিয়া সাজিবার" চেষ্টার কোনও সার্থকতা নাই। করিতে গেলে, নানা অনপেক্ষিত জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, যে-সব প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নাই, হওয়া দুরূহ। (২) উচ্চারণের ও বানানের অসামঞ্জস্য, পীড়াদায়ক হইলেও যাহা বহু শতকের অভ্যাসে লোকে মানিয়া লইয়াছে, এইরূপ "অবৈজ্ঞানিক" বানান সহিয়া গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞন-সম্মত হইলেও লোকে নূতন বানানে অস্বস্তি বোধ করে, প্রচলিত নিয়ম বর্জন করিয়া নূতন কিছু আনিয়া, নূতন জিনিস লইয়া, লাখ-লাখ, এমন কি কোটি-কোটি মানুষের সুবিধা না বুঝিয়া, কেবল পরীক্ষা বা গবেষণা করিবার আকাঙ্ক্ষার কোনও সার্থকতা নাই। ইংরেজিতে knight (ক্নিঘ্‌ট্) এই সুপরিচিত বানান ছাড়িয়া কেহও nite বা nait (নাইট) এখনও পছন্দ করে নাই, usual ছাড়িয়া yuzhuaal বানানের প্রচলনের চেষ্টাও সফল হয় নাই। তেমনি বাঙ্গলায় "লক্ষ্মী" (=ল-ক্‌-ষ্‌-ম্‌-ঈ) বানানের বদলে "লোক্‌খি," "সহ্য" (=স-হ্‌-য) বানানের বদলে "শোজ্‌ঝো" (কলিকাতার চলিত-ভাষার উচ্চারণ ধরিয়া) অথবা "শইজ্‌ঝ" (পূর্ব-বঙ্গের কোনও-কোনও অঞ্চলের উচ্চারণের নকল করিয়া) লোকে এখন গ্রহণযোগ্য মনে করে না। তদ্রূপ সাধু-ভাষায় "কলিকাতা"-ই সমধিক কার্য্যকর, কলিকাতার প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়া "কোল্‌কাতা" বা "কোল্‌কেতা" বানান বহু খাস কলিকাতা-বাসীর পক্ষে পীড়াদায়ক, এবং "কোল্‌কেতা" লিখিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙ্গভাষার ক্ষেত্রের মধ্যে দুই-তিহাই (তিন ভাগের দুই ভাগ) অঞ্চলে প্রচলিত "কইল্‌কাতা" (বা "ক'লকাতা")-ই বা চলিবেনা কেন?

এই ব্যাপারে আমি, বিশেষ বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে, জানাইয়াছিলাম—বাঙ্গলার খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ, বাঙ্গলা কৃৎ-তদ্ধিতের সুপ্-তিঙন্ত পদের উচ্চারণের ইতিহাস একটু বিচার করিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়, কেন এই প্রচলিত বানান দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা কি---বাঙ্গলা ধ্বনিতত্ত্বের ও রূপতত্ত্বের বিচারে এই বানানের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয় কিনা, তাহা দেখা আবশ্যক।

একখানি বহুল প্রচারিত বাঙ্গলা দৈনিকে, বাঙ্গলা বর্ণমালায় সংযুক্ত বর্ণের অবস্থান হানিকর, প্রধানতঃ এই বিচারে, সংযুক্তবর্ণ বর্জন করিয়া যে অভিনব বানানের প্রচার করা হইতেছে—তৎসম্বন্ধে ভাষার ইতিহাস বিচার করিয়া, বিশ্বের আর পাঁচটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার নজীর বিচার করিয়া আমার বক্তব্য আমি সব দিক্ হইতেই জানাইয়াছিলাম। তাহাতে কোনও রূপ অসম্মান, উষ্মা বা শ্লেষ প্রকাশ করি নাই। পুরা ব্যাপারটির আলোচনা পরে ইংরেজিতেও Philological Society of Japan-এর আন্তর্জাতিক বিচারের অন্যতম প্রকাশ-ক্ষেত্র পত্রিকাতে-ও প্রকাশিত করি। আমার বক্তব্যগুলি যে ভ্রান্ত, ইহা প্রদর্শিত হইলে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা আমি বর্জন করিব। আমার Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এই-সব কথার পূর্ণ বিবেচনা আছে, এবং তাহা দেশের ও বিদেশের ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার বাঙ্গলা লিপির একটি প্রাথমিক কথা—ইহাতে তাহার নাড়ীর খবর নিহিত। বাঙ্গলার কতকগুলি নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে—যথা, আদ্য অক্ষরের উপরে বলাঘাত, দ্বিমাত্রিকতা, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি। শব্দের অন্তে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গলা উচ্চারণের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; বাঙ্গলা উচ্চারণ অনুসারে, সব সময়েই বিদেশী শব্দের syllable বা অক্ষরে পর-পর অবস্থিত অন্তিম দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি আসিবেই, অথবা বিকল্পে শব্দের অন্তে এই দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনির আশ্রয়-স্থল রূপ একটি স্বরধ্বনির আগম হইবে—এই-সব কথা, বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতির পক্ষে মৌলিক, আধার-ভূত কথা। কোন্ বাঙ্গালী "লরড" (=ল-র-ড) এই বানান দেখিয়া, শব্দটিকে "ল-রড্" রূপে না পড়িয়া, ইহাকে "লর্ড" (বা "লর্‌ড্") রূপে পড়িবে? "পয়েনট, জয়েনট" = ইংরেজির point, joint শব্দ-দ্বয়ের বাঙ্গলা প্রতিবর্ণী-করণের নূতন প্রস্তাবিত রূপ দেখিয়া, একাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে "পয়ে-নট্, জয়ে-নট্" রূপে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। অথচ এই নবীন বানানে, কেবল নূতনত্বের মোহ ছাড়া আর কি আছে? কেবল সংযুক্ত-বর্ণ-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিসের সিদ্ধি এইরূপ বানানে? শব্দগুলি সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়া লিখিলে, লিখিতে আরও দীর্ঘতর হইতে বাধ্য এবং সব ক্ষেত্রে তো আমরা সংযুক্তবর্ণ একেবারে বাদ দিতেও পারিতেছি না। ইহাতে লাভ কি? কেবল "মোছ কামাইয়া মড়া হাল্‌কা-করণ" হইল না কি? ভাষার বোধগম্যতার কথা ধরিলেও, ইহা কতটা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইল, তাহার বিচার করিব না? বাঙ্গলা

"তারক, পালক, গায়ক, রজক, মশক, বালক" প্রভৃতির সঙ্গে "আরক"-ও পাই, উচ্চারণে আ-রক্ (যথা—"যোয়ানের আরক"), কিন্তু খামখা "আরক" শব্দের প্রচলিত উচ্চারণকে জবর-দখলে আনিয়া, Joan of Arc (বা Jeanne d' Arc) এই বিদেশী নামটিকে বাঙ্গলায় "যোয়ান অফ আরক" (সংযুক্ত বর্ণ "র্ক" অথবা হসন্তযুক্ত বানান "র্ ক্" বর্জন করিয়া) লিখিলে কি বাঙ্গালী পাঠককে খামখা বিভ্রান্ত করা হইবে না।

এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। আমরা কোথায় ভাষার ইতিহাস-সম্মত ও প্রকৃতি সম্মত নিয়ম পালন করিয়া ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিব—না, তাহার পরিবর্তে এ কি করিতেছি? এইসব পরিবর্তনের সমর্থনে তাঁহারা যুক্তি দিন, এ বিষয়ে ভাষার ও জাতির মানসিক কল্যাণের জন্য বিচার হউক।

এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? যাহা বলিবার, ইতিপূর্বে পূর্ণভাবে তাহা বলা হইয়াছে। "অত্র বঙ্গভাষি-মনীষিণঃ প্রমাণম্"—এখানে বঙ্গ-ভাষী মনীষী ব্যক্তিগণই বিচার করিয়া মত দিন।

(২) বাঙ্গলার সাধু-ভাষা।

প্রত্যেক সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা, যাহার পুরাতন সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, বিভিন্ন প্রকারের রচনা-শৈলীর মাধ্যমে স্ব-প্রকাশ। আধুনিক ভারতীয় সমস্ত ভাষাতেই একাধিক শৈলী দেখি। পুরাতন চালের ভাষা, সর্বত্রই পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ সাহিত্যে নিবদ্ধ। এই-রূপ ভাষা সর্বত্রই জোরের সঙ্গে চলিতেছে, ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, এক বা একাধিক কথ্য বা মৌখিক ভাষা অথবা বোলীর (বা বুলীর) আধারে গঠিত চল্‌তি বা চলিত ভাষা, বা লঘু শৈলীর ভাষাও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। উচ্চারণ সম্বন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবার সুবিধা বা তাগিদ বা গরজ নাই। কিন্তু ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এক সাধারণ আধুনিক বা নবীন যুগের সাহিত্যিক আরবী আছে, যে আরবী প্রাচীন কোরান ও উচ্চকোটির সাহিত্যের ভাষা ঘেঁষিয়া চলে, একটু লেখাপড়া জানা মানুষ না হইলে যাহার পূর্ণ রস সাধারণ আরবী-ভাষী গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই ভাষা সংবাদ-পত্রে, পত্রিকায়, সাধারণ-পাঠ্য উপন্যাসে ও কবিতায়, এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে ব্যবহৃত হয়,—পশ্চিম আফ্রিকার মোরোক্কো হইতে পশ্চিম এশিয়ার ইরাক, এবং আরব-দেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র। কিন্তু তাহা ছাড়া, মগরেব বা মোরোক্কো, অল্-জজাইর বা অল্‌জিয়ার্স, তুনিস, লিবিয়া, মিসর, সিরিয়া, সুদান, ইস্রাএল, লেবানন্, নজ্‌দ্, য়েমন্, অদন্ (এডেন্), ইরাক্ প্রভৃতির কথ্য ভাষাও আছে, সেগুলির অল্পস্বল্প সাহিত্যিক প্রয়োগও হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাহিত্যিক নব্য আরবীকে আশ্রয় করিয়া এখনও আরব-জাতির ভাষাগত ঐক্য বজায় আছে। ইংরেজীর বিভিন্ন প্রকারের কথ্য ভাষার অন্ত নাই, সেগুলির ব্যাকরণ আছে, সাহিত্যও আছে। দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের ভদ্র শিক্ষিত সমাজের ভাষাই হইতেছে সর্বজন-স্বীকৃত Standard English,

কিন্তু স্কচ্ বা স্কট্স্ ইংরেজি, আইরিশ ইংরেজি, অস্ট্রেলীয় ইংরেজি, আমেরিকার নানা প্রকারের ইংরেজিও আছে। Standard ইংরেজির সাহিত্যিক রূপে, আমরা নঞর্থক not শব্দ পুরা রূপে পাই, কিন্তু ইহার চলিত সংক্ষিপিত রূপ n't, কথ্য ভাষায় not কে প্রায় অপ্রচলিত করিয়া দিয়াছে। মুখের কথায় ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যিক বইয়ে cannot, donot, have no, প্রভৃতি স্থলে can't, don't, haven't যথেষ্ট পরিমাণে পাই বটে, কিন্তু ইংরেজির সেকেলে "সাধু" রূপ cannot, do not, have not প্রভৃতিকে, "চলিত" রূপ can't, don't, haven't একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, প্রগতিশীল ইংরেজ-জাতির ভাষার ক্ষেত্রে ইহার "সাধু" রূপ একেবারে দূরীভূত করিয়া দিবার ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। তেমনি ইংরেজি here is, it has, I am, he is, সাধু-ভাষার পূর্ণ রূপ, চলিতেছে; চলিত-ভাষার here's, it's, I'm, he's—এখানে ইংরেজি ভাষার একমাত্র রূপ বলিয়া এগুলির পক্ষে জোর ওকালতি আরম্ভ হয় নাই। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ভাষায় কতকগুলি অধুনা-অপ্রচলিত ক্রিয়া-রূপ দূর করিয়া দিয়া, মৌখিক বা "চলিত" ভাষাকেই একাধিপত্য দিবার চেষ্টাও দেখিনা—যেমন ফরাসীর সামান্য অতীত je fus = 'আমি হইলাম বা ছিলাম' সাহিত্যের ভাষায় পাই, কিন্তু পারিসের "চলিত"-ভাষায় ইহা লুপ্ত—ইহার স্থলে পাই j'ai été; তদ্রূপ je fis = 'আমি করিলাম', তৎস্থলে j'ai fait; je dis—'আমি বলিলাম'—তৎস্থলে j'ai dit. পারিসের ভাষায় অপ্রযুক্ত je fus, je fis, je dis কিন্তু দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রভাঁসাল-ভাষীদের দ্বারা লিখিত ও কথিত ফরাসীতে এখনও চলে—যেমন বাঙ্গলা সাধু-ভাষার রূপ "জানিয়া, বুঝিয়া, করিয়া" প্রভৃতি বরিশাল জেলার কোনও-কোনও স্থানে পূর্ণ প্রাচীন রূপে কথ্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান—যদিও অন্যত্র (কলিকাতার চলিত-ভাষায়) "জেনে, বুঝে, ক'রে", (ঢাকার ভাষায়) "জাইন্যা বা জানা, বুইঝা, কইরা বা ক'র্যা" প্রভৃতি।

বাঙ্গলা সাধু-ভাষা ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা এখনকার "পশ্চিম-বঙ্গ" ও "বাংলা-দেশ" নিবাসী দশ কোটির উপর সমগ্র বঙ্গ-ভাষী জনগণের মাতৃভাষা, বিভিন্ন কথ্য ভাষা, বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও, সেগুলিকে এক সাধরণ ভাষার গণ্ডীর মধ্যে সাধু-ভাষার-সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। এই যোগসূত্রকে ছিন্ন করিয়া দিলে, ভাষার রাজ্যে ঐক্য-বোধ নষ্ট হইয়া যাইবে। বহু পূর্বে এই ভাবে ঢাকার বাঙ্গলা ও কলিকাতার বাঙ্গলাকে পৃথক্ করিয়া বাঙ্গলা-ভাষী জাতির মৌলিক ঐক্য ধ্বংস করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল—লর্ড কার্জনের আয়োজিত Partition of Bengal বা বঙ্গ-ভঙ্গের দ্বারায়।

বিগত উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই সৃজ্যমান সাধু-ভাষা তাহার আধুনিক রূপ গ্রহণ করিল। রামমোহন রায়, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন,

মীর মশার্‌রফ হোসেন, বিপিনচন্দ্র পাল – ইঁহারাই ছিলেন এই সাধু-ভাষার স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা, এবং ইহার মধ্যে এক অপূর্ব শক্তির আবাহন ইঁহারাই করিলেন। কিন্তু মৌখিক বা চলিত ভাষার, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতার শিক্ষিত জনের ভাষার প্রতি অবহেলা কেহই করেন নাই। পদ্য-সাহিত্যে বিশেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম করা যায়। লঘু, সাময়িক এবং অল্প-শিক্ষিত জনের মধ্যে প্রচলিত লোকরঞ্জক কাহিনী-সাহিত্য ও নাটকে এই চলিত-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। বিগত শতকের ছয়ের দশকে, শুদ্ধ সাধু-ভাষায় মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র চলিত-ভাষায় বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি Classic বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিলেন—"হুতোম পেঁচার নক্‌শা।" সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার মধ্যে ভাষার মিলন বা ঐক্য স্থাপিত করিতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ-ও চলিত-ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। রবীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে ছিলেন সব্যসাচী। পরিণত বয়সে লেখা তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" বিশুদ্ধ সাধু-ভাষায়, কিন্তু তাঁহার যৌবনের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' চলিত-ভাষায়; এবং সারা জীবন ধরিয়া গদ্যে ও পদ্যে তিনি উভয়বিধ বাঙ্গলায় লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী, গুরু-গম্ভীর বিষয়েও কলিকাতার চলিত-ভাষা ব্যবহারের একজন প্রমুখ সংস্থাপক হইলেও, সাধু-ভাষাকে উপেক্ষা করেন নাই, উচ্চ-কোটির ভাব-গম্ভীর রচনায় তাহার ব্যবহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এই দুই প্রকারের বাঙ্গলা পরস্পর-বিরোধী ইহা মনে করিয়া, কতকগুলি বঙ্গ-ভাষানুরাগী, আমার মতে, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষা বাঙ্গলার ক্ষতি করিবার কাজে নামিয়াছেন। এই দুই প্রকারের বাঙ্গলাকে কি একেবারে পৃথক্ করা যায়? সাধু-ভাষার রূপ বাদ দিয়া কি বাঙ্গলা লিখিত ও মৌখিক উভয়-বিধ সাহিত্য রচনা সম্ভবপর? সাধু-ভাষার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ কেন? বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের রচনা হইতে সাধু-ভাষায় ব্যাকরণ-সম্মত রূপগুলিকে বর্জন করিয়া, সেগুলির স্থলে অন্য রূপ বসাইয়া দিয়া, বাঙ্গলা-ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনীষাকে এইভাবে অপমান করিবার অধিকার কোথা হইতে আসিল? সাধু-ভাষার রূপ বিতাড়িত করিলে, রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তিগুলির সৌন্দর্য্য কোথায় থাকিবে?

"ভরা নদী ক্ষুর-ধারা খর-পরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল' বরষা।"

"ঘুমের দেশে **ভাঙ্গিল** ঘুম, **উঠিল** কলস্বর।
গাছের শাখে **জাগিল** পাখী, কুসুমে মধুকর।"

"সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কি লয়ে' বিচার?'
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় **করিতে** পারি উলট-পালট।"

"বলো কোন্ পার **ভিড়িবে** তোমার সোনার তরী।"
"অসীম রোদন জগৎ **প্লাবিয়া** দুলিছে যেন।"
"তার পরে কভু **উঠিয়াছে** মেঘ, কখনো রবি।"
"**হাসিতেছ** তুমি **তুলিয়া** নয়ন, কথা না ব'লে।"
"**কহিবে** না কথা, **দেখিতে** পাবো না নীরব হাসি।"
"নিদ্রা **টুটিয়া** সহসা চকিতে **চমকিয়া বসিলাম**।"
"শিহরি' শিহরি' সর্ব শরীর **কাঁপিয়া উঠিল** ত্রাসে।"
"পুরোহিত শুধু মন্ত্র **পড়িল** আশিস **করিয়া** দোঁহে।'
"আমি **কহিলাম**—'সব **দেখিলাম**, তোমারে দেখিনি শুধু'।"
"অপরূপ তানে ব্যথা **দিয়া** প্রাণে **বাজিতে লাগিল** বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী **হাসিতে লাগিল** হাসি।"
"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা **সহিতে**।"

সাধু-ভাষা হইতেছে প্রশস্ত রাজমার্গ। ইহার বাক্যরীতি সরল, যুক্তিযুক্ত, বাঙ্গালীর চিন্তাধারার অনুরূপ। ইহাতে কিছু লিখিলে, একটি পরিচ্ছন্ন মনন ও বিচারশীলতার সহায় সহজেই পাওয়া যায়। সাধু-ভাষা এবং কলিকাতার চলিত-ভাষা ও বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য-ভাষার পরস্পরের সম্পর্ক হইতেছে, বাঙ্গলা লোকোক্তি-মত, "চাটাই-বোনা" সম্পর্ক। সাধু-ভাষা ও সারা বঙ্গদেশের নানা চলিত-ভাষা—বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের চলিত-ভাষা, এই দুইয়ের টানা ও পড়িয়ান মিলিয়া বাঙ্গলার ভাষার অপূর্ব ধূপ-ছায়া বা ময়ূর-কণ্ঠী রঙের ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে—যে বস্ত্রজাত পরিধেয় ও উত্তরীয় দ্বারা অভিনব শুচি-স্নিগ্ধ রুচির জ্যোতিতে বিশ্ব-সরস্বতী মহীয়সী হইয়াছেন। একদিকে বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস"-এর গদ্য, বঙ্কিমের "কপাল-কুণ্ডলা"-র গদ্য, রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" বা "উর্বশী" কবিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত, রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতি, অপরূপ সৌন্দর্য্যে সুদীপ্ত রবীন্দ্র-প্রশস্তি, বঙ্কিমের "ইন্দিরা" ও "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর প্রাঞ্জল-ভাষা; অন্যদিকে বিবেকানন্দের "পরিব্রাজক"-এর, অবনীন্দ্রনাথের "রাজ-কাহিনী"-র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি"-র, উমাপ্রসাদের হিমালয়-বর্ণনার অনবদ্য কবিতাধর্মী ভাষা; সাধু ও চলিত-ভাষা নির্বিশেষে বাঙ্গলা সাহিত্যের, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ বহু বহু রচনা আছে;—এগুলির কোন্‌টিকে ত্যাগ করিব? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু-বর্ষ-ব্যাপী ম্যাট্রিকুলেশন ও স্কুল-ফাইনাল, ইণ্টারমিডিয়েট ও বী এ. পরীক্ষায় বাঙ্গলা-ভাষার প্রধান পরীক্ষকের কাজ করিবার সময়ে, বাঙ্গালাদেশের গৌড় ও রাঢ়, বরেন্দ্র ও কামরূপ, বঙ্গ ও শ্রীহট্ট, ভাগীরথীর দুই তীরের দেশ, সমতট বা ব-দ্বীপ, কুমিল্লা (পট্টিকেরা) ও চট্টল, ওদিক সুহ্ম বা মেদিনীপুর, এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত প্রদেশ—সারা বাঙ্গালার সমস্ত জেলার ছাত্রদের হাজার হাজার উত্তর-পত্রের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, সাধু-ভাষাতে সহজ, সাবলীলভাবে, বিনা আয়াসে সকলেই যেন লিখিতেছে—

এবং যেখানেই আধুনিক হইয়া কলিকাতার চলিত-ভাষায় উত্তর-রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেখানেই বিপদে পড়িতেছে,—এমনকি কলিকাতা ও ভাগীরথী-নদীর তীরের দেশের ছেলেমেয়েরাও। একটা জিনিস দেখিয়া কৌতুক লাগে—অবশ্য তাহার কারণও মনে হয় খুঁজিয়া পাইতেছি,—যাঁহারা এখন বিশেষ-ভাবে কলিকাতার চলিত-ভাষায় আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাধু-ভাষাকে বর্জন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব-বঙ্গের মানুষ। কলিকাতার ভাষায় লিখিয়া তাঁহারা আনন্দ পান, এবং তাঁহারা বোধ হয় চাহেন, ভাষা-বিষয়ে সর্বত্র বাঙ্গালাদেশ একটি Monolithic State ("একশৈল বা এক-পাথরিয়া প্রদেশ") হইয়া যাউক্—একটিমাত্র কথ্য ও তাহার আধারে স্থাপিত লিখিত ভাষাই সর্বজন-গৃহীত হউক। ইহাই যেন তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু যেখানে ⅞ বা ⅞ ভাগ বঙ্গ-ভাষী সহজ-ভাবে ঘরে কলিকাতার বাঙ্গলা বলে না, অন্যান্য উপভাষা বলে যেগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার উচ্চারণে, ব্যাকরণে, বাক্‌ভঙ্গীতে কণ্ঠের স্বরে কলিকাতার ভাষা হইতে নানা ভাবে স্বতন্ত্র, তাহাদের পক্ষে এই-ভাবে অন্য একটি কথ্য ভাষাকে একেবারে নিজের করিয়া লওয়া যে সম্ভবপর নহে, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। পূর্ব বঙ্গে যাঁহাদের জন্ম, বাল্যশিক্ষা ও আংশিক ভাবে জীবনের কর্মক্ষেত্র, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ চলিত-ভাষার বাঙ্গলা বলেন লেখেন। কিন্তু সব সময়ে এই চলিত-ভাষায় তাঁহাদের প্রবেশ, পূর্ণ রূপে হইয়া উঠে না; ইহা বলিলে ও লিখিলে-ও, উচ্চারণে, কথা বলার ঢঙ্গে, ধাতু-রূপ এবং অব্যয় শব্দাদির প্রয়োগে, বাক্য-রীতিতে, শব্দাবলীতে, কলিকাতার ভাষায় অজ্ঞাত এমন সমস্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যাহা কলিকাতার মানুষের কানে বাজে, পীড়া দেয়, ক্বচিৎ হাস্যের উদ্রেক-ও করে। পরলোকগত সজনীকান্ত দাস তাঁহার "শনিবারের চিঠি"তে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদের অনেকের রুচি এবং নীতির কঠোর সমালোচনায় কখনও-কখনও এইরূপ ভ্রান্ত প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। কেন এই বিড়ম্বনা সহা? অথচ সকলের সম্পত্তি সর্বজন-বোধ্য সাধু-ভাষা ব্যবহারে, কোনও ঝঞ্ঝাট হয় না। কলিকাতার ভাষায় "পূজা, তুলা, মুলা, বুড়া, খুড়া" প্রভৃতি সাধু-ভাষার শব্দে—যে সব-শব্দ চলিত-ভাষার এলাকার বাহিরে সারা বাঙ্গালা-দেশে প্রচলিত —সেগুলির রূপ হয় পুজো, তুলো, মুলো, বুড়ো, খুড়ো। ইংরেজী ভাষাতে পুংলিঙ্গে he-his-him হইল, তো স্ত্রীলিঙ্গে "she shes shim হইবে না কেন"—এই নীতিতে, "পোকা" অর্থে কলিকাতার চলিত-ভাষার রূপ "পুকো" হইবে নিশ্চয়, এই বিচারের জনৈক লেখক "পোকা" স্থলে "পুকো" লিখিলেন। কৈফিয়ৎ চাওয়ায় জানা গেল, তাঁহার নিজের গৃহের ভাষায় তিনি "পুকা" বলেন, "পুকা" সাধু-ভাষার শব্দ স্থির করিয়া, তাহার বিকারে "পুকো" কলিকাতার বাঙ্গলার শব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া লইলেন। কলিকাতার চলিত ভাষায়, বাঙ্গলার "স্বরসঙ্গতি"র নিয়ম অনুসারে, "পূজা, তুলা খুড়া" প্রভৃতি "পুজো, তুলো, খুড়ো" হইয়া যায়। কিন্তু "পোকা, বোকা, খোকা, ঘোড়া, বোড়া-সাপ" প্রভৃতি

"পুকো, বুকো, খুকো, ঘুড়ো, বুড়ো" হয় না। সহজাত অধিকারে এই রূপগুলি না আসিলে, অভিনিবেশের সঙ্গে শিক্ষা করিয়াও সেগুলিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু আমরা তো আর শ্রম করিতে চাহি না, পরিশ্রম না করিয়াই সবকিছু অর্জন করিবার অভ্যাস, জীবনের আর সব ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা আমাদের মজ্জাগত করিয়া লইয়াছি। এ বিষয়ে আর বেশী কথা বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। আমার বিনীত নিবেদন, সাধু-ভাষা ও চলতি-ভাষা উভয় মিলিয়া একই ভাষা। এই দুইটির মধ্যে একটা গভীর বা দুরপনেয় পার্থক্যের কল্পনা করিলে, বাঙ্গলা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চা এবং উন্নতি-সাধন যখন আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত, তখন বাঙ্গলা-ভাষার শিক্ষার ও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে অতি-আবশ্যক এই সহজ পরিপাটী বা নিয়ম পালনে বাধা আসিয়া যায়। সহজকে জটিল বলিয়া, ছাত্রদের বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়া কি উচিত হইবে? এ কথা কেহ না মনে করেন, যে আমি চলিত ভাষায় লেখার বিপক্ষে। আবশ্যক হইলে, নিজে আমি চলিত-ভাষায় প্রচুর পরিমাণে লিখিয়া থাকি, আবার সাধু-ভাষাতেও লিখি। বাঙ্গলা-ভাষার এই জুড়ি হাঁকাইবার শক্তি সকলেরই থাকা উচিত বলিয়া মনে করি।

(৩) বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ।

আমার কাছে বাঙ্গলা-ভাষার বহু শিক্ষক বিভ্রান্তিতে পড়িয়া, প্রায়ই বাঙ্গলা-ভাষার পণ্ডিতগণের অনুমোদিত প্রচলিত ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি-সঙ্গত "শুদ্ধ" প্রয়োগ কেন বাঙ্গলা ভাষায় মানা হয় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পাঠান। বাঙ্গলার সন্ধি ও সংস্কৃতের সন্ধি—দুইটি কি পৃথক্ বস্তু? এ দুইটির স্ব-স্ব প্রকৃতি কি? বাঙ্গলা শব্দরূপে বিভক্তি কয়টি, এবং প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি-কল্পনা বাঙ্গলার পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য কিনা? বাঙ্গলা ক্রিয়ার tense বা কালরূপের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ, বাঙ্গলায় বিশেষণের তার-তম্য, বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদ; বাঙ্গলার নিজস্ব কতকগুলি জিনিস, সংস্কৃত ব্যাকরণে যেগুলির নামগন্ধও নাই—যেমন অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, প্রতিধ্বনি শব্দ, সহায়ক-ক্রিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি ভাল করিয়া বুঝিবার ও শিখাইবার কথা কেহও চিন্তা করিয়া দেখে না—ফলে জিজ্ঞাসু শিক্ষক বিপদে পড়েন, ছাত্রদেরও বিপদে ফেলেন। আমার ষাট বৎসরের চিন্তা ও বিচারের ফল, আমি যথা-জ্ঞান আমার লিখিত পুস্তকে পরিবেশন করিয়া আসিয়াছি; এবং বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবারে সংস্কৃতের প্রকৃতি নহে, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সুযুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আমার পুস্তকে সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হইয়া, বাঙ্গালা-দেশের শিক্ষক ও পণ্ডিতদের কাছে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন গতানুগতিকতা এবং চিরপোষিত নানা ধারণা, যেগুলি যুক্তি-সহ এবং ইতিহাস-সম্মত নহে সেগুলি পরিহার করিয়া, বাঙ্গলা ব্যাকরণের চর্চায় নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর ও বিচার-শৈলীর প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন।

(৪) বাঙ্গলা-ভাষার শব্দের নিরুক্তি।

অষ্টাদশ শতকের কতকগুলি ইউরোপীয় (পোর্তুগীস) পাদ্রির ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, সংস্কৃত বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষা, লাতীনেরই বিকার। এই বোধ অনুসারে, পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও (১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) স্থির করিয়াছিলেন—বাঙ্গলা "কত" শব্দ লাতীন quanto-র বিকার-জাত। বাঙ্গলা-ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মোটামুটি ইহাই হইতেছে এক কথায়, বাঙ্গলা-ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস। কিন্তু বাঙ্গলা সোজা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তনে তাহার নিজরূপ পাইয়াছে, একথাকে একটু বাড়াইয়া বলিতে হয়—সংস্কৃত পড়ার পরিবর্তনে প্রাকৃত ভাষা, এবং সেই প্রাকৃত ভাষার পুনঃপরিবর্তনে বাঙ্গলা প্রভৃতি "ভাষা" অর্থাৎ আধুনিক আর্য্য ভাষা। বাঙ্গলা ব্যাকরণের চর্চার এই শব্দ নিরুক্তি ও আসে, কিন্তু তাহা ব্যাকরণ-পর্য্যায়ের অন্তর্নিহিত নহে, তাহা বাহিরের বস্তু। অনেক সময়ে বাঙ্গলার শিক্ষকেরা ব্যাপারটা তলাইয়া দেখেন না, সেই জন্য ব্যাকরণের মধ্যে এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করেন—"আনাড়ী, ভাল, বেহালা" শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখ; "সেতার, আমরা" শব্দের সমাস (একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে "আমরা" হইতেছে একশেষ-দ্বন্দ্ব—যেহেতু "আমি, তুমি, সে, অন্যরা" প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-সমাস কোঠায় দাঁড়াইয়াছে "আমরা"!)

এই-সব কারণে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যুৎপত্তি-নির্দেশক সম্পূর্ণ বাঙ্গলা অভিধানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এ বিষয়ে কিছুটা কাজ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাঙ্গলা-ভাষার ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা শব্দকোষ এ বিষয়ে পরিষদের প্রথম পদক্ষেপ। পরে প্রয়াগের ইণ্ডিয়ান-প্রেসের জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং তদনন্তর বিশ্বভারতীর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-ও তাঁহাদের দুই খানি বড়-বড় অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ উভয়ই নির্দেশের চেষ্টা করেন। আমার বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বড় বইয়ে (Origin and Development of the Bengali Language-এ) আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এ বিষয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক সুকুমার সেন একটি বহু মূল্যবান্ গবেষণাত্মক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া, দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন—চর্যাপদের যুগ হইতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলা শব্দকোষ, রোমান অক্ষরে ছাপাইয়া তাহা বাহির করিয়াছেন—ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ করিয়াছেন ও সর্বত্র সাহিত্য-প্রয়োগ উদ্ধার করিয়াছেন। উভয় দিক্ হইতেই এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা-ভাষার চর্চায় অমূল্য। বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণের সত্যকার প্রকৃতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা-শিক্ষক ও লেখকদের, একটু বেশী করিয়া অবহিত হওয়া সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

(৫) বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণ।

এইটি পরিষদের অন্যতম প্রধান কার্য্য-রূপে পরিগণিত হইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের classics অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ অথবা ঐতিহাসিক মানের, গ্রন্থ পরিষদ্ সুযোগ পাইলেই মুদ্রিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা-ভাষার ইতিহাসে কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ,

যথা প্রাচীন বাঙ্গলা "চর্য্যাপদ", আধুনিক আর্য্যভাষার চর্চায় যাহার মূল্য অপরিসীম, এবং মধ্যযুগের বাঙ্গলার সবাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"—যথাক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পরিষদ্-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ৮০ বৎসর ব্যাপী পরিষদের কার্য্যসূচী অগৌরবের নহে। কিছু কাল হইল, পরিষদ্ এ বিষয়ে নূতন পদক্ষেপ করিয়াছেন—বাঙ্গলার প্রধান-প্রধান লেখকদের সম্পূর্ণ রচনাবলীর প্রকাশন। কতকগুলি বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রকে এই বিষয়ে পথিকৃৎ বলা যায়—যেমন "বসুমতী", "হিতবাদী" ও "বঙ্গবাসী"। পরিষদ্ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের স্রষ্টা যুগন্ধর লেখকদের গ্রন্থাবলী, যত্নের সঙ্গে ভালভাবে সম্পাদিত করিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। ইহার দ্বারা যদুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতি-বিদ্‌গণের লিখিত ভূমিকাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ লেখকগণের সমগ্র রচনা বাহির হইয়া বঙ্গভাষার সাহিত্যের মর্য্যাদার সংরক্ষণ করিতেছে, তদ্রূপ সাধারণ পাঠক-ও সুন্দর-ভাবে সুপণ্ডিতের হাতে প্রস্তুত লেখমালা পাইয়া তাহা হইতে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আনন্দ ও লাভ প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেন। এ বিষয়ে অন্যান্য বহু প্রকাশক আরও অধিক পরিমাণে বাঙ্গলার প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনাবলী প্রকাশ করিয়া, এখন বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।

ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু কতকগুলি বাহিরের প্রকাশক, কেবল নিজ-নিজ আর্থিক লাভের কথা ভাবিয়া, অন্যায় ও অনুচিত ভাবে পরিষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বল্প অর্থাগমের পথও রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা, পরিষদের দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রকাশিত কতকগুলি লেখকের রচনাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ, যে-সব রচনার কোনও কপিরাইট আর নাই, পরিষদ্-ভবনে আসিয়া তাহার পূর্ণ-ভাবে নকল করাইয়া লইয়া প্রকাশিত করিতেছেন,—এই নকলে পরিষদের সংস্করণের ছাপার ভুল পর্য্যন্ত সংশোধন করিয়া দেখিবার অবসর তাঁহারা পান না। এবং—

"আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া"—

পরিষদের বইয়ের এই নকলী সংস্করণ, পরিষদের সংস্করণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া পরিষদের ক্ষতিই করিতেছেন—এমন কি, পরিষদের বিজ্ঞাপনী-ফলকে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনও লাগাইয়া দিয়া যাইতেছেন যে তাঁহাদের এই প্রকাশন, পরিষদের প্রকাশন অপেক্ষা অল্প মূল্যে পরিষদের সদস্যরা আসিয়া ক্রয় করুন।

এই রূপ ব্যাপার যে হয়, দেশবাসী জানিয়া রাখুন। আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

(৬) আধুনিক বাঙ্গলা অনুবাদ সাহিত্য।

বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা হইতে সেই সব ভাষার শ্রেষ্ঠ রস-রচনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসারণ করা

পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কার্য্যে পরিষদ্ কিছু-কিছু হাত দিয়াছেন, কিন্তু বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিনয়কুমার সরকারের গিজোর ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাস বইখানির বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্গদেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও-কোনও পণ্ডিত এবং প্রকাশক এইরূপ কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গলা-ভাষাকে অর্পণ করিয়াছেন। পঞ্চানন তর্করত্নের পরিচালনায় "বঙ্গবাসী" মুদ্রণালয় হইতে বঙ্গাক্ষরে সমগ্র রামায়ণের সংস্কৃত সংস্করণ (বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত), বঙ্গাক্ষরে সমগ্র মহাভারত, তদ্রূপ বাঙ্গলা হরফে আঠারোখানি পুরাণ, বাঙ্গলা অনুবাদ সমেত অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশ, বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি লক্ষণীয় গৌরব-ভূমি। সম্প্রতি খড়দহ বলরাম মন্দির হইতে স্বামী যতীন্দ্র রামানুজ দাস যে শ্রী-সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ও তমিল গ্রন্থাবলীর অনুবাদের বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব-বোধের সহিত সম্পূর্ণ অনুমোদন-যোগ্য। বিশেষতঃ তমিল সাহিত্যের "আড্‌বার" বা প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তদের পদাবলীর সংগ্রহ (১১শ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত) "নালু-আয়ির-প্রবন্ধম্"-এর (অর্থাৎ "চারি-সহস্র-গাথা"র) মূল তমিলপদ, প্রত্যেক তমিল্ শব্দের বাঙ্গলা আক্ষরিক অনুবাদ, বাঙ্গলা অনুবাদ ও বাঙ্গলা টীকা যেভাবে স্বামী যতীন্দ্র রামানুজ দাস প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। সম্প্রতি দিল্লীর "সাহিত্য একাডেমি"-ও ভারতের নানা আধুনিক ভাষায় বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের ভার লইয়াছেন, তাহার সুবিধা বাঙ্গলা-ভাষাও পাইতেছে—প্রায় ২৫ খানি অনুবাদ বাঙ্গলা-ভাষায় এ যাবৎ বাহির হইয়াছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই-সব অনুবাদ মূল ভাষা হইতে নহে, ইংরেজি অথবা হিন্দী অনুবাদের অনুবাদ। আমরা চাহি যে, যথাসম্ভব মূল ভাষা যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহাদের-অনুবাদ বাঙ্গলায় প্রকাশিত হউক। যেমন গিরিশচন্দ্র সেন-কৃত প্রাচীন মারাঠী "জ্ঞানেশ্বরী" গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা তকঝি শিবশঙ্কর পিল্লার বিখ্যাত মালয়ালী উপন্যাস "চেম্-মীন্"-এর অনুবাদ। অভিধান প্রণয়ন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণের পরে, এই কার্য্য গ্রহণ করিতে পারা যায়—ইহা প্রাথমিক কর্ত্তব্যের মধ্যে অন্যতম বিবেচিত হইলেও, যোগ্য কর্মীর অভাব-ই এ কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রধান অন্তরায়।

কতকগুলি অত্যাবশ্যক ব্যাপার আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম। আমাদের মাতৃভাষা যে সময়ে মাগধী অপভ্রংশের নবতর প্রকাশ রূপে, বাঙ্গলা ভাষা, গৌড়-বঙ্গের ভাষা, গৌড়ীয়-ভাষা, বঙ্গাল-ভাষা, রূপে প্রকট হইতেছে, তখন হইতেই এই ভাষার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় এই সৃজ্যমান বা নবসৃষ্ট বঙ্গ-ভাষার যে প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার পুনরায় পাঠ করিয়া, আমাদের মাতৃভাষার অশরীরী আত্মার প্রতি, রামমোহন অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর বঙ্কিম বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব-সুন্দর ভাষার প্রতি প্রণাম জানাইয়া, প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। গৌড়-বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ-সেন দেবের সভায় বটুদাস-পুত্র শ্রীধর-

দাস একজন প্রধান সভাসদ্ ছিলেন, তিনি ছিলেন জয়দেব গোবর্ধনাচার্য্য উমাপতিধর শরণ ও ধোয়ীর সহিত এক সাহিত্য-গোষ্ঠীর মানুষ। তিনি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে "সদুক্তিকর্ণামৃত" নামে একটি সংস্কৃত কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে কেবল "বঙ্গাল কবি" অর্থাৎ বাঙ্গাল (বা বাঙাল) কবি, বা পূর্ব-বঙ্গের কোনও এক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত আর্য্যাছন্দের এই প্রশস্তিটিও ধরিয়া দেন; এবং এই প্রশস্তি প্রত্যেক বঙ্গভাষীর মনকে উৎফুল্ল করিবে, ও মাতৃভাষার গৌরবে অপার আনন্দদায়ী করিবে—

"ঘনরসময়ী গভীরা বক্কিম-সুভগা উপজীবিতা কবিভিঃ।

অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ॥"

"গঙ্গা ও বঙ্গভাষা—ঘন-রসময়ী (নদী-পক্ষে—প্রচুর জলযুক্তা; ভাষা-পক্ষে—নানা সাহিত্যরসের আকর), গভীরা (নদী-পক্ষে—গভীর খাত-যুক্তা; ভাষা-পক্ষে—গভীর ভাবময়ী), বক্কিম (নদী-পক্ষে—আঁকা-বাঁকা গতিযুক্ত, ভাষা-পক্ষে—বাঁকা অর্থাৎ সুন্দর) ও সুভগা (নদী-পক্ষে—সুন্দরী বা সৌভাগ্য-আনয়নকারিণী; ভাষা-পক্ষে—মনোহরা); এবং বহু কবি এই গঙ্গা-নদীকে ও বঙ্গভাষাকে আশ্রয় করিয়াছেন। গঙ্গানদীর এবং বঙ্গভাষার পুণ্য স্রোতে অবগাহন করিলে, মানুষকে পবিত্র করে॥"

গঙ্গার মত পবিত্র আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলার জয় হউক॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং বঙ্গভাষী জনগণ মাতৃভাষার সেবা ও উন্নতি-সাধন করিয়া ধন্য হউক॥

———

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

অশীতিতম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ—চৈত্র

১৩৮০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

॥ ত্রৈমাসিক ॥

বর্ষ ৮০ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ মাঘ—চৈত্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে দেখি নারী পুরুষের সমকক্ষরূপে স্বীকৃত। তিনি বৈদিক যুগে সংহিতার সূক্ত রচনা করেছেন। উপনিষদে দেখি তিনি বিতর্ক-সভায় পুরুষ দার্শনিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন। তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে দেখি নারী নিপীড়িত, নিগৃহীত এবং শৃঙ্খলিত, অন্দরমহলে অবরুদ্ধ জীবন তাঁর উপর কঠিন হস্তে সমাজনেতা আরোপ করেছেন। লেখাপড়ার সহিত সংস্রব নেই। পুরুষের সেবাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দ্ধারিত হয়েছে।

নারীর এই ঐকান্তিক অবনতা অবস্থা হতে উন্নয়নের জন্য রামমোহন যে আন্দোলন সুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে নারীকে জাগ্রত করে তার নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি চেয়েছিলেন নারী নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য উচ্চশিক্ষা পাক। তাই বাংলার প্রথম বালিকা প্রতিষ্ঠান বেথুন বিদ্যালয়কে তার প্রথম সম্পাদকরূপে গড়ে তোলেন। তাই যখন চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহিলা পরীক্ষার্থী হয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি চন্দ্রমুখীকে একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন।

চন্দ্রমুখী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার অনুসরণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর দুই মেয়ে। উভয়েই পরবর্তী জীবনে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের একজন হলেন মহর্ষির দৌহিত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী। অপরজন হলেন তাঁর পৌত্রী সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী। সরলা দেবী ছিলেন ইন্দিরা দেবীর থেকে এক বছরের বড়। উভয়েই অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। সরলা দেবী পাশ করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। তিনি ঘরে পড়ে ফরাসী ভাষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। আজ ইন্দিরা দেবী আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

ইন্দিরা দেবীর জীবন যে এইভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তা অকারণে নয়। তার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হল ভারতের প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের। সত্যেন্দ্রনাথ যেটিকে তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন তা হল নারীকে শৃঙ্খলিত অবস্থা হতে মুক্ত করে নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতের সমাজে মেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রা রীতির সহিত পরিচিত হয়ে তাঁর এই ইচ্ছা আরও বলবতী হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর রচিত 'আমার বাল্যকথা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না।"

তাই তিনি পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তিন বছর বিলাতে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, পশ্চিমের নারীসমাজের সহিত পরিচিত হলে এই মহিলা দেশের নারীদের নিজেদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করবেন। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। কারণ, এই মহিলা উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাগরণের আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন বিলাতে যান তখন ইন্দিরা দেবীর বয়স চার বছর। সুতরাং বাল্যে তিনি পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের স্বাধীন পরিবেশের সহিত পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তিনিও স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করে চলেন। তারই সার্থক পরিণতি হিসাবে দেখি তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিত করেছিল। ফলে পিয়ানো এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কয়েক বছর পরে ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এম. এ.তে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। পরে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে আসেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুরাগ। এমন যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন কচিৎ ঘটে। উত্তরকালে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুণবতী পত্নীর সাহচর্য নিশ্চয় বিশেষ সহায়তা করেছিল। প্রাচীন বয়সে তাঁরা উভয়েই কলকাতা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেখানে বিশ্বভারতীর জন্য যখন প্রথম উপাচার্য পদ সৃষ্টি হয়, ইন্দিরা দেবীই সেই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সেখানেই পরিণত বয়সে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। খুড়ো এবং ভাইঝির মধ্যে এমন প্রীতির বন্ধন ইতিহাসে বিরল। তাঁরা কাছাকাছি থাকেন নি, দূরে থেকেছেন; কারণ ইন্দিরা দেবীর জীবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয়েছে পিতার সঙ্গে সুদূর বোম্বাই প্রদেশে। তবু এই আকর্ষণ। দূরত্বের ব্যবধান হেতু চিঠিপত্রেই সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। এর সূত্রপাত হয় যখন ইন্দিরা দেবী মায়ের সঙ্গে বিলাতে ব্রাইটনে বাস করতেন। মেজদার সঙ্গে প্রথম বিলাত গিয়ে কিছু দিন ব্রাইটনেই রবীন্দ্রনাথকে যাপন করতে হয়। তখন ভাইপো ও ভাইঝির সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ হয়।

এই স্নেহবন্ধন পরস্পরের চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল পুষ্টিলাভ করেছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি সংরক্ষিত অবস্থায় পাই; কিন্তু ইন্দিরা দেবীর লিখিত চিঠিগুলি পাই না। পেলে বোঝা যেত তিনি নিপুণতার সহিত

প্রথিতযশা রবিকাকার সঙ্গে ভাববিনিময় করছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি ইন্দিরা দেবী সযত্নে রক্ষা করেছিলেন এবং ফলে তা পরে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিগুলিতে এমন বিষয় নেই যা স্থান পায় নি। সেগুলির রচনাকাল ১৮৮৭—১৮৯৫। ইন্দিরা দেবী তখন বাল্যজীবন শেষ করে তারুণ্যে ধীরে ধীরে পদার্পণ করছেন। তাতে যেমন উত্তরবঙ্গের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা আছে, বিভিন্ন মানুষের ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, তেমন সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর চর্চা আছে; এমন কি বেদান্ত নিয়েও আলোচনা আছে। এটা সম্ভব হত না যদি না তিনি ইন্দিরা দেবীর মত সংবেদনশীল শ্রোতা পেতেন, যিনি পত্রলেখককে অসংকোচে প্রাণ খুলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে উৎসাহিত করতে পারতেন।

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ ভালরকম অবহিত ছিলেন। তাঁর ৭ই অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে লিখিত চিঠিতে তিনি একথা স্বীকার করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

"আমি তো আরও অনেক অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।…… তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব যেন তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।"

এইভাবে "ছিন্নপত্রাবলী" ইন্দিরা দেবীর জীবনে সব থেকে বড় কীর্তি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের পত্রসাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলা সাহিত্যের এই সৌভাগ্যের পথ প্রস্তুতির জন্য ইন্দিরা দেবী চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব সাহিত্য রচনার নিদর্শন যৎসামান্য। কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর। পিতামাতার প্রতি বিশেষ কর্তব্য হিসাবে তিনি 'পুরাতনী' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাতে আছে তাঁর মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা এবং তাঁর মাকে লিখিত তাঁর পিতার পত্রাবলী। ঠাকুর পরিবার সম্পর্কিত গবেষণার কাজে এটি একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি আশীর্বাণী জানিয়েছিলেন এমন এক সময় যখন তিনি নিতান্তই বালিকা। তাতে আছে:

সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ।

দেখা যায় তাঁর রবিকাকার এই আশীর্বাদ তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর দীর্ঘ জীবন সুন্দর ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে সার্থকতামণ্ডিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে (২৯শে চৈত্র ১৩৮০) পঠিত।

ইন্দিরাদেবী স্মরণে

চিত্রিতা দেবী

অনেক মানুষের জীবনেই কাব্যের উপাদান থাকে সত্যি, কিন্তু কজনে আর জীবনকে কাব্যের মতো করে গড়ে তুলতে পারে? কাব্যের মত ছন্দিত সুষমায় মণ্ডিত, কাব্যের মত অর্থবহ, ব্যঞ্জনাময়; কাব্যের মত দুঃখসুখের কাহিনীর মধ্যে জন্মলাভ করেও সেই ইতিবৃত্তটুকুর গণ্ডী পেরিয়ে সর্বমানবের চিত্তলোকে উত্তীর্ণ হবার মতো সৌন্দর্য্যময় সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কয়েকজন মনস্বী ও মনস্বিনীর আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা জীবনকে অনুশীলিত পরিশীলিত করে কাব্যের মত রসসমৃদ্ধ ও ছন্দোময় করে তুলতে পেরেছিলেন। ইন্দিরা দেবী তাঁদের মধ্যে একজন।

ঊনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীর পক্ষেই গৌরবের কাল। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সূত্রপাতও সুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর সুরুতে, যদিও রামমোহনের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করা অবশ্য এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

আমরা আজ ইন্দিরা দেবীর শত বৎসরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সেই স্মরণীয়া বরণীয়াকে স্মরণ করতে এসেছি। বরণীয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। ইন্দিরা দেবীকে নিঃসন্দেহে রমণীশ্রেষ্ঠা বলা চলে।

আজকের যুগে রমণীকে বিশেষ করে রমণীভাবে দেখবার কথা ভাবা হয় না। নরনারী নির্বিশেষে মানুষ আজ মানুষ নামেই পরিচিত হতে চায়। সেই জন্যেই এযুগে স্ত্রীপুরুষ (বিশেষত ইয়োরোপে) শুধু যে তাদের পোষাকের তারতম্য ঘুচিয়ে দিতে চাইছে তাই নয়, পুরুষ তার পুরুষোচিত কীর্তিকলাপ এবং নারী তার রমণীসুলভ বিশেষ গুণগুলির দিকে আর মন দেবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

ইন্দিরাদেবী কিন্তু বিশেষভাবে রমণী। যদিও সেযুগে যে সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে পুরুষোচিত বলে গণ্য হত ইন্দিরাদেবী সে সমস্তই অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। যেমন সেযুগে বাঙালী পুরুষদের পক্ষেও মোটামুটিভাবে B. A. পাশ করাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে করা হোত। তাতেই মুন্‌সিফ, সাবজজ, এমনকি ডেপুটী হওয়াও হয়ত দুর্লভ হোত না। ইন্দিরাদেবী ১৮৷১৯ বছর বয়সে B. A. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে য়ুনিভার্সিটী থেকে "পদ্মাবতী মেডেল" পান। এদিকে আবার Trinity College থেকে music-এর ডিপ্লোমা পাশ করেন।

শিক্ষার দিক থেকে তিনি কোন পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। আবার রমণীর বিশেষ সদ্‌গুণগুলির একটীও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। "স্নেহে মাতা, কর্মে সে পুরুষ"

চিত্রাঙ্গদার এই বাণী তাঁর জীবনে সত্য হয়েছিল। পরিবারের সকলের দেখাশোনা গৃহস্থালীর কর্তব্য, সবদিকে তাঁর নিরলস সজাগ দৃষ্টি ছিল। শুনেছি আশ্রিত পরিজনদের খাবার সময় তিনি একটী বেতের মোড়ায় বসে ভৃত্যদের কাছে বাজারের হিসাব নিতেন। এই সুযোগে লক্ষ্য রাখতেন তাঁদের ঠিকমত যত্ন করে খেতে দেওয়া হচ্ছে কিনা।

এছাড়া তাঁর অসাধারণ পাতিব্রত্য ধর্ম তাঁকে চিরকালের যশস্বিনী ভারতীয় নারীদের সমগোত্রীয়া করে তুলেছে। গান্ধারীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে বেমানান হয় না। যৌবনে তিনি ছিলেন সর্বকর্মে স্বামীর সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী। নিজে তিনি শুধু যে উচ্চ-শিক্ষিতাই ছিলেন তা নয়, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যক্ষেত্রেও শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। "নারীর উক্তি", "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে", "রবীন্দ্রস্মৃতি", "বাংলার স্ত্রীআচার", "হিন্দুসংগীত", "রবীন্দ্রস্মৃতি", প্রভৃতি কয়েকটী বইএর মধ্যে তিনি তাঁর সাহিত্য-রচনার পরিচয় রেখে গেছেন। চেষ্টা করলে এবং ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আরো লিখতে পারতেন, কিন্তু স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যজীবনের সঙ্গিনী হওয়াকেই তিনি বেশী কাম্য মনে করতেন। তিনি "বীরবল"কেই বড় করতে চেয়েছিলেন, নিজেকে নয়। শুনেছি প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের লেখা "চারইয়ারী কথা"র এত চমৎকার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, যা পড়ে অনুবাদ না মৌলিক রচনা—বোঝা যেত না। সবুজ পত্র প্রকাশের সময় তিনি নানা-ভাবে স্বামীকে সাহায্য করেছেন। এদিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে যথার্থ জীবনসঙ্গিনী, আবার তাঁর অত্যাশ্চর্য সেবাপরায়ণতা তাঁকে করে তুলেছে ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রতিমা।

দশ বারো বৎসর ধরে অসুস্থ স্বামীকে যেভাবে শিশুর মত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তাঁর তুচ্ছতম প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, অন্তরে বাইরে প্রসন্নতার উপরে মালিন্যের ছায়া ফেলতে দিতেন না, তাতে তাঁকে সকল যুগের সকল দেশের নারীমাত্রের আদর্শ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা ইন্দিরাদেবীকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটির প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এটী অবশ্য ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেন, তাঁরা নিশ্চয় মনে করতে পারবেন, নৃত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীত পরিবেশনায় যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার দিকে তাঁর কি আগ্রহ ছিল।

আমরা ইন্দিরাদেবীকে দেখেছি শেষ বয়সে, যখন তিনি অসুস্থ স্বামীকে সর্বদা আগলে রাখতেন; তাঁর পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, কাঁধের ওপোর ব্রোচটী লাগানো,—কোথাও এতটুকু শৈথিল্য বা অমনোযোগের পরিচয় নেই।

যাঁরা তাঁকে যৌবনে দেখেছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি,—তিনি অসামান্য রূপসী ছিলেন। যেমন রঙ, তেমনি মুখশ্রী, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু, ঘন

কালো দীর্ঘ কেশ,—এক কথায় পরমাসুন্দরী, যেন রূপকথার রাজকন্যা। রূপে যেমন, গুণেও তেমনি অতুলনীয়া। বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, মহর্ষির নাত্‌নি, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা, রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রী, নিজেও উচ্চশিক্ষিতা, বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বধূ, সাহিত্যক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী,—এর যে কোন একটা গুণ কিছুটা পরিমাণে থাকলেও অনেক মেয়েরই গর্বে নাসিকা একটু উন্নত হোতই। কিন্তু শুনেছি, ইন্দিরাদেবী চিরকাল একই রকম নিরহঙ্কার! সকলের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন,—হাসি গল্পে কোথাও আভিজাত্যের আড়াল টানতেন না।

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে সকলেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সস্ত্রীক পাশাপাশি দুই ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে হাওয়া খাওয়ার গল্প অনেকেই জানেন। কিন্তু পরিবারের অবরোধ প্রথায় প্রথম ভাঙন ধরিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নবীনা বধূকে শুধু বোম্বাই নয় বিলেত পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে। বিলেতে গিয়ে দুই শিশু সন্তান নিয়ে বরফঝরা শীত অবহেলা করে কি করে তিনি সুযোগ্য গৃহিণীপনায় আতিথ্যে সেবায় তৎপর হয়ে দুটী বছর কাটিয়েছিলেন ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য্য লাগে।

ইন্দিরাদেবীর নিজের মুখে গল্প শুনেছি,—"মা তো ছিলেন যেন ছোটো পুতুলটীর মতো। বাবা সব কিছু শিখিয়েছিলেন মাকে। শুধু ইংরেজী বলা কওয়াই নয়, ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।" বিবিদি বলতেন,—"ইংরেজী সাহিত্যে রস পেতে আমরা শিখি সেই শিশুবয়সেই, প্রথম হাতেখড়ি মায়ের কাছে।"

মায়ের কাছে বসে সাত বছর বয়সে টমাস মুরের কবিতা মুখস্থ করেছেন; বুঝতে শিখেছেন শেলীর 'Clouds', তখন থেকেই ছিলেন অতি সুকণ্ঠের অধিকারিণী। বিলেত থেকে ফিরতিপথে জাহাজের ক্যাপ্‌টেনকে Irish melodies গেয়ে শোনাতেন।

আজকের দিনে আমরা স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় এক অর্থেই ব্যবহার করি। মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করা আর পোষাকে-আসাকে শালীনতা বর্জন করা যেন এক পর্য্যায়ে পড়ে। ইন্দিরা দেবীর কথা বলতে গিয়ে, আজকের যুগের মেয়েদের কথা সহজেই ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর মহারথীরা ভারতকে নানা দিক দিয়ে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন সমাজের অর্ধেককে অন্ধকারে রেখে বাকি অর্ধেক আলোকিত হতে পারে না। তাই নারীজাগরণ তাঁদের অন্তরের কামনা ছিল। কিন্তু তাঁরা ভারতের নারীকে ভারতের নারীরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। ভারতের নারী যেন আপন ঐতিহ্যের উপরে দাঁড়িয়ে জগতের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারিণী হতে পারে। শিক্ষা যেন চরিত্রকে উন্নত করতেই সহায় হয়—তাকে যেন স্বধর্মবিচ্যুত না করে, এই ছিল সে-যুগের কামনা।

কলকাতায় এসে ইন্দিরা প্রথমে সিমলা কনভেন্টে ও পরে ভর্তি হলেন কলকাতার

লরেটোয়। খাস বিলেত থেকে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলেন তাতে মর্চে ধরতে দিলেন না মা-বাবা। Cambridge পাশ করলেন ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য নিয়ে। একদিকে চলছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র শেখা অন্যদিকে ভারতীয় হাবভাব, বাঙলা সাহিত্য ও ভারতীয় সংগীতের চর্চা।—একদিকে পিয়ানো, ভায়োলিন,—অন্যদিকে সেতার এস্রাজ।—কমলার মত শ্রীময়ী ইন্দিরা সরস্বতীর মত ধীময়ী বীণাপাণি হলেন। এছাড়াও তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার কথা সকলেই জানেন।

শান্তিনিকেতন থেকে যখন বাংলায় বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশ করা স্থির হল প্রমথবাবুকে সম্পাদকরূপে বরণ করা হল। কিন্তু তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তিনি নিজে প্রায় কিছুই করতে পারতেন না। সেই সময়ে ইন্দিরাদেবী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকা সম্পর্কে সমস্ত কাজ করতেন। সেই সময়কার একজন লিখেছেন,—ইন্দিরাদেবী তখন খুব যোগ্য একজন পুরুষের মত বিচক্ষণতার সঙ্গে লেখা ও সম্পাদনার কাজ করেছেন।

এ সমস্ত ছাড়াও আর একটী কারণে বাংলাসাহিত্যরসিক মাত্রেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁকে উপলক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি উৎসের মত ঝরে পড়েছিল। ভাইপো-ভাইঝিদের মধ্যে ইন্দিরাই ছিলেন কবির সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী।

ব্রাইটনে গিয়ে সাতবছরের সুরেন আর পাঁচবছরের বিবিকে নিয়ে কিশোর কবি নূতন সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

"ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন পরে অনেকবার হইয়াছে। এখনো তার প্রয়োজন ফুরায় নাই, কিন্তু সে শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার সুযোগ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল। দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল"। আমার কেমন মনে হয় "জগৎপারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা"র মধ্যে ব্রাইটনের সমুদ্রতীরে সেই দুই শিশুর সঙ্গে কবিহৃদয়ের আনন্দমিলনের যোগ আছে।

রবীন্দ্রনাথের অসীম স্নেহের সুযোগ পেয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী। "মঙ্গলগীতি" ও "উপহার" নামে দুটী অপূর্বসুন্দর কবিতা লিখেছিলেন ইন্দিরা দেবীকে। যাঁরা বলেন কাব্যের মধ্যে উপদেশ ও নীতিমূলক কথা থাকলে তা কাব্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, এদুটী কবিতা পড়লে তাঁদের ভুল ভাঙবে, তাঁরা বুঝতে পারবেন কবিতা যদি কবিতা হয় তবে উপদেশ-বিষয়ক হলেও তা কবিতাই থাকে।

ইন্দিরা দেবীর এক জন্মদিনে তাঁকে পিয়ানোর গড়নের এক দোয়াতদানী উপহার দিয়ে "উপহার" কবিতার দুটী ছত্র লিখে দেন,—

"স্নেহ যদি কাছে রেখে দেওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,

কতগুলো তবে জিনিষপত্র

বল্ দেখি দিত কে তোরে।"

ছিন্নপত্রের পত্রাবলী ইন্দিরাদেবীকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তাঁরো কিছু কৃতিত্ব ছিল কিনা এটাও একটু ভেবে দেখবার বিষয়।

এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী নিজে লিখেছেন "এই চিঠিগুলির উপলক্ষ্য হওয়া ছাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুক আছে যে সেই অল্পবয়সেই আমি তার মর্য্যাদা বুঝে তার সাহিত্যিক অংশগুলি সাধারণ পারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটী খাতায় তারিখ সমেত লিখে রেখেছিলুম। পরে সেই খাতা তাঁকেই দিয়েছিলুম। সেই খাতা থেকেই "ছিন্নপত্র" বইখানি ছাপানো হয়"।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমিও জানি বব্, তোমাকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি, তাতে আমার মনের বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোন লেখায় হয় নি।...... তোকে আমি যখন লিখি, তখন আমার মনে হয় না, যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবিনে, কিম্বা বিশ্বাস করবিনে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলিকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্যে আমি যেরকম ভাবি, ঠিক সেই রকমটী অনায়াসে বলে যেতে পারি।...... আমাকে একবার তোর চিঠিগুলি দিস বব্।...... যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে একদিন নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে যাব। তখন পূর্বজীবনের এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে।"

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে স্নেহলাভ অনেকেই করেছেন। তিনি অন্তরে স্নেহশীল, প্রেমময়। যে তাঁর কাছে গেছে সেই কিছু না কিছু স্নেহলাভ করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু সকলেই তো দেখি সেই স্নেহকে তাদের গর্বের মূলধন করে ব্যবহার করছে। কজনে আর তাঁর আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছে কিম্বা চেয়েছে।

ইন্দিরাদেবীর জীবনে মনুষ্যত্বের আদর্শ এমন সহজে স্বীকৃত হয়েছে, যা এযুগে কচিৎ কখনো চোখে পড়ে। এতটুকু কৃতিত্ব দেখালেই তার জয়ঢাক বাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠছে আজকের মানুষ। ইন্দিরা দেবীর দীর্ঘ জীবনে কত কৃতিত্ব। শেষ বয়সে শান্তিনিকেতনে এসে নানাদিক থেকে নিজেকে এই বিদ্যালয়ের মধ্যে দান করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের আগেকার সব গানই তাঁর কণ্ঠে ধরা ছিল। পুরোনো কালের বহু গান, যা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, সেই সবই তিনি আবার ফিরিয়ে এনে দিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে। 'স্বরলিপি সমিতি'র প্রধানা হিসাবে তাঁর দান অপরিসীম। কিছুদিনের জন্যে শান্তি-নিকেতনের উপাচার্যের পদও তাঁকে নিতে হয়েছিল। কিন্তু যখনি গিয়েছি, দেখেছি তিনি তাঁর বিরল-উপকরণ ছোটো বাড়ীটিতে অনায়াস মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাঁর শুধু কেশ এবং বেশবিন্যাসের জন্যে দুজন পরিচারিকা ছিল তিনি

বিত্তহীনতার মধ্যে কি স্বাভাবিক ভাবেই না নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ হাসিটীর মধ্যে মলিনতার ছায়া পড়েনি. আনন্দের রস শুকিয়ে যায় নি, ছোটোবড় সবার সঙ্গে অজস্র গল্প করে যাবার মতো মানসিকতার ক্ষয় হয় নি।

ধনীর দুলালী, স্নেহের পুতলী, যেদিন ধনে মানে আরেক সেরা ঘরের বধূ হয়ে গেলেন, সাহিত্যজগতে রবিকা'র সঙ্গে স্বামী প্রমথ চৌধুরীর মিলন হল, রবীন্দ্রনাথের নাম অঙ্গীকারে নূতন সাহিত্য-পত্রিকা বের করলেন প্রমথ চৌধুরী. সেদিন সে কি জমজমাট সময়। তার পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল জীবনে,—ম্লান হয়ে এল্ল ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বছরের পর বছর নিজের হাতে (নার্স রেখে নয়) স্বামীর পরিচর্য্যা করলেন। তারপরে একদিন শুভ্র বসন পরে একলা দাঁড়ালেন পৃথিবীতে।

কুমারীবেলায় যখন একলা ছিলেন, তখনকার সঙ্গে এখনকার কত তফাৎ। এখন আর আগের প্রিয় পরিজনরা কেউ নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন, রবিকা'র কর্মক্ষেত্রে রবিকা-ই নেই। কিন্তু বাইরে রিক্ততার আবরণ থাকলেও অন্তরে মহাধনী হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘ জীবন সত্যভাবে যাপন করার দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁকে মহীয়সী করে তুলেছে। আর তিনি স্নেহের ভিখারী নন, এখন তিনিই সবাইকে স্নেহ দান করেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর ছোটো ঘরটী দেখতে দেখতে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। যেখানে যত দলাদলি থাক, তাঁর ঘরে সকলের সমান আদর। 'বিবিদি' সকলেরই মনের মানুষ। বিবিদির কাছে এসে মনের কথা বলা সবচেয়ে সহজ।

গুরুদেব যাবার পরে শান্তিনিকেতনে যাব মনে করলে ঐ একটী নামই প্রথমে মনে পড়ত। ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিমা দেবী দুজনের কাছেই অকারণে এত স্নেহ পেয়েছি সে ভোলবার নয়।

সেবারে শ্রাবণ মাসে দুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। প্রথম দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। দ্বিতীয় দিনে ফেরার আগে সকাল বেলায় ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম বিবিদির স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়ে গেছে। উজ্জ্বল চেহারা ঝলমল্ করছে। বড় বড় কালো চোখে একটুও নেই বার্ধক্যের ছায়া। শুধু কপালের দুই পাশে দুই গুচ্ছ সাদা চুল, আর বাকি মাথাটা একেবারে নিকষকৃষ্ণ।

—"আশ্চর্য্য বিবিদি, চুলগুলো এমন Jet black করে রেখেছেন কি মন্ত্রে ?" হাসতে হাসতে বল্লাম। বিবিদি বল্লেন—"হ্যাঁ, তাই তো ওরা বলছিল, বিবিদি, কোন্ দোকানের কলপ মাখেন, বলে দিন তো নামটা। সত্যি আজকাল তো দেখি একটু বয়স হতে না হতেই চুল পাকে। আমাদের সময়ে সেই দেখতুম—" ব্যস, সুরু হয়ে গেল বিবিদির গল্প। কত কত গল্পই সেদিন করলেন, রবিকা'র কত গল্প। এমন কি তাঁর যে নতুন কাকিমাকে নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের মাথাব্যথার অন্ত নেই তাঁর কথাও অনেক গল্প করলেন। সব শুনে

মনে হল, এ গল্পগুলি যদি বিবিদি ছাপার হরফে শুনিয়ে যেতে পারতেন, তাহলে অনেকের কৌতূহল মিটত। শুনতে শুনতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যতবারই উঠতে যাই বিবিদি বলেন "আর একটু বোস। এতদিন পরে এলে, তাও একদিনের জন্যে।"

"সত্যি বিবিদি, শুধু আপনার জন্যেই আসতে ইচ্ছা হয়।"

"কোথায় যাবে এখন? তোমাদের সেই কলকাতায়? কি যে আছে তোমাদের কলকাতায়, জানি নে বাপু। তোমার এই কন্যেটী বুঝি লরেটোয় পড়ে? আমাকেও মা লরেটোয় ভর্তি করিয়ে দিলেন। মা মনে করতেন,......" ব্যস্, বিবিদির আর এক ঝাঁক নতুন গল্প সুরু হয়ে গেল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, তবু উঠতে হল। মনে হল যেন নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, সামনের মাসেই আবার কদিনের জন্যে এসে বিবিদির মুখ থেকে সেকালের গল্প কিছু টুকে নিয়ে যাব। কে জানত এই দেখাই শেষ দেখা! সেই উজ্জ্বল সহাস্য মূর্তি আর মাত্র দুদিনের জন্যে রয়েছে এই পৃথিবীতে।

১২ই আগস্ট ৮৮ বছর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন। তখনো রবীন্দ্র-সপ্তাহ চলছিল। ইন্দিরা দেবীর তিরোধানে সে-যুগের শেষ যোগসূত্রটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দী তার কর্মে ও সাধনায় ভারতের নারীর মধ্যে যে আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবে ও জীবনব্রতে যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, স্বর্গতা ইন্দিরাদেবীর মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার সার অংশটুকু গ্রহণ করেছিলেন ইন্দিরা,—হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যে।

পশ্চিমের কর্মদক্ষতা, নিরলসতা ও তেজস্বিতাকে ভারতের সতী নারীর আদর্শ সত্যনিষ্ঠা, সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কর্তব্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে তাঁকে সফলতা দান করেছে। চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অনমনীয় রেখেছিল। সুখের সময় তাঁকে আমি দেখিনি। যে সময়ে তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর খুব সুখের সময় নয়। কিন্তু তাঁকে দেখে কে সেকথা বলবে?—

"অন্তর হতে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন,
সংসারধূলিজালে।"

আজ তাঁর কথা লিখতে বসে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাঁর স্নেহময়ী মূর্তি।—কাণে বেজে উঠছে সেই কণ্ঠস্বর।—বহুকালের সাধা গলা, সর্বদাই একটু উঁচু সুরে বাঁধা থাকত।

তাঁর রবিকা'র আদর্শ তাঁর মধ্যেও বিকশিত হয়েছিল। তিনিও অন্তর হতে আহরি বচন, দীর্ঘ আশি বছর ধরে গীতরসধারা ঢেলে গেছেন। এরই নাম বোধ হয় যোগযুক্ত চিত্ত,—

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

ধনে যেমন নির্ধনেও তেমনি।—তাঁর অন্তরের রসধারা, কণ্ঠের সুরধারা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ ধন ও নির্ধনকে অতিক্রম করে যে অমৃতধারা প্রাণকে প্রতিনিয়ত আনন্দের মধ্যে বিধৃত রাখে, সেই অমৃতধারায় তিনি শিশুকাল থেকে সিক্ত ছিলেন।

তিনি পরিণত বয়সে পৃথিবীর কাজ শেষ করে চির আনন্দলোকে চলে গেছেন যেখানে—মধুর বাতাস, মধুর সাগর, মধুর ধরণীধূলি,—

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ॥
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত)

মানুষ মধুসূদন

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

মানুষ মধুসূদন কেমন ছিলেন, তাহার কিছু কিছু আভাস তাঁহার জীবনী এবং রচনা হইতে পাওয়া যায়। আভাস বলিতেছি, কারণ সম্পূর্ণ মানুষটির পরিচয় পাওয়া শক্ত। আমরা যাঁহাদের সংস্পর্শে প্রত্যহ আসি, এমন কি যাঁহাদের আমরা বন্ধু বলিয়া দাবী করি, তাঁহাদের আমরা চিনি কি? মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা প্রায় অসম্ভব। সব মানুষই মনে মনে বহুরূপী। কিন্তু তাহার সামাজিক আচার-ব্যবহারে সেরূপ ক্বচিৎ প্রতিফলিত হয়। সামাজিক মানুষ একটা মুখোস-পরা মানুষ। কবি মধুসূদনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহার মুখোস বারবার খুলিয়া পড়িত এবং ভিতরের মানুষটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। তিনি ভণ্ডামি করিতে পারিতেন না। ধনী রাজনারায়ণ মুন্সীর একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। বড় আদরের পুত্র, জননী জাহ্নবীর নয়নমণি। পুত্রকে তাঁহারা শাসন করিতে পারিতেন না, তাহার সঙ্গত অসঙ্গত সব আবদারই পূর্ণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিলাসী ও দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার সহিত মিশিয়াছিল তাঁহার কবি-প্রতিভা, তাঁহার বল্গা-বিহীন কল্পনার আবেগ, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁহার বিদ্রোহী মন, তাঁহার দিলদরিয়া স্বভাব এবং হিন্দু-কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাব, যে প্রভাবের মূল সুর ছিল—শিকল ভাঙো, শিকল ভাঙো, অগ্রগতির বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ কর। বলা বাহুল্য দেশের এই বিদ্রোহী আবহাওয়া সেকালের যুবকদের কেবল সংস্কারমুক্তই করে নাই, উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছিল। মধুসূদনও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ বসুর সম্মুখেই তিনি মদ্যপান করিতেন। প্রকাশ্যে গরু-খাওয়া, কোর্টশিপ করিয়া বিবাহ করা, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্রিশ্চান হওয়া তখন প্রগতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। মধুসূদন এই প্রগতির খরস্রোতে গা ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রগতির পটভূমিকায় মধুসূদনের যে ছবি আমরা দেখিতে পাই তাহাতে সনাতন ভারতীয় রং এবং প্রাচীন বাঙালী আভিজাত্যের জৌলুষই বেশী পরিস্ফুট। অত্যন্ত সৌখীন বাবু ছিলেন তিনি। যখন হিন্দু কলেজে পড়িতেন তখন এদেশে মোটর ছিল না। হুম্‌ব্রো হুম্‌ব্রো শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তিনি পাল্‌কি চড়িয়া কলেজে আসিতেন। সঙ্গে তিনটা বাড়তি স্যুট থাকিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্যুট বদলাইতেন তিনি। তাঁহাকে ঘিরিয়া উৎকৃষ্ট আতরের গন্ধ সর্ব্বদা ভুর ভুর করিত। সে আতর তিনি নিজেই কেবল ব্যবহার করিতেন না, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণও করিতেন। ভালো ভালো খাবার এবং উৎকৃষ্ট মদের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সে খাবার ও মদ তিনি একা খাইতেন না; সবান্ধবে খাইতেন।

তাঁহার বাড়ীতে এবং কখনও কখনও হোটেলে তিনি প্রায়ই সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রীর অজস্রতা তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সাক্ষ্য বহন করিত। তিনি গণিয়া, মাপিয়া বা হিসাব করিয়া কিছু করিতে পারিতেন না। এমন কি কুলী বা গাড়োয়ানকে যখন ভাড়া দিতেন তখন পকেটে হাত ঢুকাইয়া একমুঠো টাকা বাহির করিয়া না দিতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। এই দিলদরিয়া মেজাজের দাবী পূর্ণ করিতে না পারিলে তিনি ক্ষেপিয়া যাইতেন। কেহ তাঁহার আভিজাত্যে আঘাত করিলে তিনি প্রত্যাঘাত করিতেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনি যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বিশপ্‌স্ কলেজে পড়াশোনা করিতেছিলেন তখন 'নেটিভ'দের প্রতি সাহেবদের মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিশপ্‌স্ কলেজে নিয়ম ছিল খাওয়ার শেষে প্রত্যেককে 'ওয়াইন' দেওয়া। মধুসূদন দেখিলেন 'নেটিভ'দের বেলায় প্রায়ই 'ওয়াইন' দেওয়া হয় না। অজুহাত, ওয়াইন্ না কি ফুরাইয়া গিয়াছে। মধুসূদন মদের গ্লাস টেবিলের উপর চুরমার করিয়া উঠিয়া আসিলেন। 'নেটিভ' শব্দটাই তিনি অপছন্দ করিতেন। আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছিল। বিশপ্‌স্ কলেজের ছাত্রদের জন্য একটা uniform ছিল। কিন্তু মধুসূদন দেখিলেন যে ইউনিফর্ম সাহেবদের জন্য যে রকম, নেটিভদের জন্য সে রকম নয়। তিনি প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, এ বিভেদ আমি মানিব না। আমি আমাদের নিজেদের জাতীয় পোষাক পরিয়া কলেজে যাইব। সাদা সিল্কের কাবা, তদুপরি নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত রঙীন শালের রুমাল, মাথায় শালের বহুবর্ণবিচিত্র পাগড়ি,—এই পোষাক পরিয়া তিনি কলেজে গিয়াছিলেন। নেটিভদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাদা ক্যাসক বর্জন করিয়া জাতীয় পোষাকে মণ্ডিত হওয়াটাই সেদিন গৌরবজনক মনে করিয়াছিলেন তিনি। সত্যই মধুসূদনের আত্মসম্মানবোধ খুব তীক্ষ্ণ ছিল। পরবর্ত্তী জীবনের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। তখন তিনি ব্যারিস্টার হইয়া প্র্যাকটিস্ করিতেছেন। মধুসূদন কোর্টে জোর গলায় বক্তৃতা দিতেন। হঠাৎ একদিন জাস্টিস্ Jaokson বলিলেন,—The Court orders you to plead slowly. The Court has ears. মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'But pretty too long, my lord'.

জজ সাহেবের মুখের উপর এ উত্তর তখনকার দিনে সাধারণ কোনও ব্যারিস্টার দিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মধুসূদন সব বিষয়েই অসাধারণ ছিলেন।

মানুষ মধুসূদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম-প্রবণতা। জীবনে তিনটি নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তিনি। দেবকী, রেবেকা এবং হেন্‌রিয়েটা। তিনজনকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনে প্রেমের প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল। এ সব জোয়ারের ইতিহাস তাঁহার প্রামাণ্য জীবনীগুলিতে আছে। সে সবের আলোচনা এ প্রবন্ধে আমি করিতে চাহি না। কোনও কোনও আধুনিক গবেষক মনে করেন যে দেবকীর

সহিত তাঁহার নাকি কোনও সম্পর্কই ছিল না। এ সব আলোচনাও এ প্রবন্ধের পক্ষে অবান্তর। তাঁহার প্রেমের ব্যাপারে যেটুকু প্রাসঙ্গিক এবং অসাধারণ তাহা এই যে শুধু তিনি মেয়েদের সম্বন্ধেই প্রেমোচ্ছ্বসিত ছিলেন না, পুরুষদের সম্বন্ধেও ছিলেন। তাঁহার বন্ধুরা—জি. ডি. বাইসাক্, ভোলানাথ, বঙ্কু, ভূদেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়, Vid—(বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি Vid বলিয়া ডাকিতেন)—ইঁহারা সকলেই ছিলেন তাঁহার প্রেমাস্পদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তো তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেন। তাঁহার এই আবেগপূর্ণ প্রেম নিবেদনে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইয়া পড়িতেন। পিতামাতাকেও খুব ভালবাসিতেন তিনি। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সে ভালবাসা সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তিনি যখন মাদ্রাজে তখন তাঁহার মাতা জাহ্নবী দেবীর মৃত্যু হয়। এ খবর শুনিয়া তিনি পিতাকে মাদ্রাজে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ যাইতে রাজি হইলেন না। পিতার মৃত্যুর পর মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহার পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে জোর করিয়া খিদিরপুরে পাঠাইলেন। খিদিরপুরে গিয়া কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দেখিলেন রাজনারায়ণের তৃতীয় পক্ষের বিধবা যুবতী স্ত্রীকে। ইহার পর বিষয় লইয়া আলোচনা করা তখন আর সম্ভব হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

ভাবের আবেগেই তিনি সারা জীবন চলিয়াছেন। যখন ব্যারিস্টার ছিলেন তখন কোন পারিশ্রমিক না লইয়া একটি গরীব ব্রাহ্মণের হইয়া তিনি মোকর্দ্দমা লড়িয়াছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণটি সুগায়ক ছিল, যাত্রায় চমৎকার 'সখী সংবাদ' গাহিতে পারিত। সাধারণ সাংসারিক হিসাবে যাহাকে আমরা 'উন্নতি' বলি মধুসূদনের মতো লোকের পক্ষে সে রকম উন্নতি লাভ অসম্ভব ছিল। এ ধরণের উন্নতি লাভ করিতে হইলে সব দিক বাঁচাইয়া যে দিকে ছাট সেদিকে ছাতাটি ধরিয়া নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া অগ্রসর হইতে হয়। মধুসূদনের প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি খেয়াল খুশীর নৌকায় হৃদয়াবেগের পাল তুলিয়া দিয়া বিপদসঙ্কুল সাগরেও পাড়ি দিতে ইতস্তত: করেন নাই। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে বিলাসজীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সে সুযোগকে তুচ্ছ করিতে তিনি ইতস্তত: করেন নাই। যেখানে একটু আপোস করিলে বা রক্ষা করিলে নিজের সুবিধা হয়, সেখানে তিনি নিজের মতে নিজের পথে চলিয়াছেন। বার বার চাকরি পাইয়াছেন, কিন্তু চাকরি রাখিতে পারেন নাই। ব্যারিস্টারি ব্যবসায় করিতে বসিয়াও তিনি ব্যবসায়ীসুলভ মুখোস পরিতে পারেন নাই, তাই সে ব্যবসায়েও

আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কম ছিল না। মনে মনে ছিলেন তিনি রাজসিক ভোগী। রাশি রাশি টাকা মুঠা মুঠা খরচ করার দিকে তাঁহার প্রবল প্রবণতা ছিল। কিন্তু সে টাকা তিনি উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না। ধার করিতেন, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধার করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, উমেশ বাবু, রাণী স্বর্ণকুমারী দেবী, তাঁহার বন্ধুরা, এমন কি দোকানদাররা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধার দিতেন। সকলে ভালবাসিতেন তাঁহাকে। তাঁহার মধ্যে এমন কি একটা ছিল—কি অদ্ভুত প্রাণ-কাড়া একটা আবেদন—যে কেহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। টাকা মারা যাইবে জানিয়াও তাঁহাকে ধার দিতেন। বিলাতের দোকানদাররাও ধার দিয়াছিলেন তাঁহাকে। ধার শোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া Grey's Inn হইতে একবার তিনি সাস্‌পেণ্ডেড্ হন, তাঁহার ব্যারিস্টারি পড়া কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া যায়। এই অপরিণামদর্শী কবি তবু কিন্তু কিছুতেই থামিতে পারেন নাই, দুর্দ্দম আগ্রহে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ভোগের ভোগবতীতে অবগাহন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার মধ্যেও এই উদ্দামতা ছিল বলিয়া তিনি পয়ারের শিকল ছিঁড়িয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাত্ত মহিমায় আত্মহারা হইয়াছিলেন, এই জন্যই 'রাম এণ্ড হিজ র‍্যাবেল্‌স্' কে তাঁহার ভালো লাগে নাই, ভালো লাগিয়াছিল ত্রিভুবনজয়ী ভোগদৃপ্ত রাবণকে। মনে মনে নিজেই তিনি রাবণ ছিলেন। সীতা অপেক্ষা প্রমীলাকেই তিনি যেন বেশী মনোরম করিয়া আঁকিয়াছেন। 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে?' —এই দম্ভোক্তির সহিত মধুসূদনের প্রাণের সুর যেন মিলিয়া গিয়াছে। অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন তিনি। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে, নিজের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার সমসাময়িক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও. সি. দত্ত প্রভৃতি অনেকে তখন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। মধুসূদনের বিচারে ইঁহারা নগণ্য ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল হোমার, মিল্টন্, ভার্জ্জিল, টাসো, শেক্স-পীয়র, তাঁহার চরিত্রে ছাপ ছিল শেলীর এবং বায়রণের। সে যুগের পাশ্চাত্য আধুনিকতার এবং প্রতিভার প্রতীক ছিলেন তিনি। মানুষ মধুসূদনের উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন চরিত্রের আর একটি বিস্ময় বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে চিরকাল স্বদেশী ছিলেন, বাঙালী ছিলেন, ভারতীয় ছিলেন। তাঁহার রচিত কালজয়ী সাহিত্যে, ইহার অজস্র প্রমাণ বর্ত্তমান। এক 'হেক্‌টর বধ' ছাড়া অন্য কোনও বৈদেশিক বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 'হেক্‌টর বধ' গদ্য কাব্য, এটিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদেশীদের লইয়া তাঁহার কিছু ছোট ছোট কবিতা আছে—যেমন কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকার, কবিবর আলফ্রেড্ টেনিসন্, কবিবর ভিক্তর হিউগো প্রভৃতি। তাঁহার বাকি সমস্ত কীর্ত্তি ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশকে কেন্দ্র করিয়া মণিমাণিক্যখচিত হর্ম্ম্যমালার ন্যায়

দেদীপ্যমান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণই তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিত্তি। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তাঁহার বাঙালী মন বঙ্গদেশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই যেন অর্ঘ্য-রচনা করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতার শিরোনাম উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, দেব-দোল, শ্রীপঞ্চমী, বটবৃক্ষ, মহাভারত, সরস্বতী, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, কোজাগর লক্ষ্মী-পূজা, কেউটিয়া সাপ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্যামা পক্ষী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীমন্তের টোপর। চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি বিদেশে—ভরসেল্‌স শহরে লিখিত। বিদেশে বসিয়াও তিনি জন্মভূমিকে ভোলেন নাই তাহার সাক্ষী এই কবিতা-গুলি। শুধু যে ভোলেন নাই তাহা নয় বাংলাদেশকে লইয়া তাঁহার কবি-প্রাণ সৌন্দর্য্যে সৌরভে যে বারবার উথলিয়া উঠিয়াছে এই কবিতাগুলি তাহারও সাক্ষী। না, পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁহার বাঙালীত্ব লোপ করিতে পারে নাই। জানি না মানুষ মধুসূদনের চরিত্র আঁকিতে পারিলাম কিনা। মধুসূদনের চরিত্র, নীতির দিক দিয়া, আদর্শ চরিত্র ছিল না। কিন্তু তাহা মন-ভোলানো মধুর চরিত্র। সর্ব্বোপরি মহাকবি মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে দিগ্‌-দিগন্ত-উদ্ভাসী সমুজ্জ্বল মহাপ্লাবন। সে প্লাবনের মুখে তাঁহার সমস্ত দোষ ভাসিয়া গিয়াছে, চিরজীবী হইয়া আছেন মহারাজার আভিজাত্যে মণ্ডিত এক মহাকবি। তাঁহাকে বারবার প্রণাম জানাই।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ মন্দিরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, ১৩৮০ পঠিত।)

কবি মধুসূদন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অসামান্য ব্যক্তিদের জীবনে অনেক সময়ে বিপরীত ভাবের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। না হলে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত মধুসূদন দত্ত কি ক'রে হ'লেন নবযুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ? যে পশ্চিমী সভ্যতাকে আমরা ভোগবাদী আখ্যা দিয়েছি, তার অনুরাগী হয়ে কেমন ক'রে তিনি আমাদের কাব্যকে কুরুচি-মুক্ত করলেন আর, বিলাত যাঁর শয়নে স্বপনে ছিল তীর্থস্বরূপ, তাঁরই কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'ল দেশপ্রেমের বন্দনা ?

বাইরে থেকে বিচার ক'রতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা ভুল করি। বিজাতীয় বেশভূষার অন্তরালে যে দেশানুরাগ প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কুরুচির প্রতি তীব্র বিরাগ নিহিত থাকতে পারে, সে-কথা প্রায়ই ভুলে যাই। কোন কোন বিষয়ে অমিতাচার সত্ত্বেও সেদিনকার নীতিভ্রষ্ট বাবু-সমাজ থেকে মধুসূদন বহু—বহু দূরবর্তী। নিন্দা প্রশংসা দুই-ই সেদিন তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। শক্তিমানদের ভাগ্যে চিরদিন তাই জোটে। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' এবং 'মেঘনাদ-বধে' তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করলেন, তার কল্লোলধ্বনি এবং দৃপ্ত গতিভঙ্গী অনেককে মুগ্ধ করল, আবার কেউ কেউ ওর ভাষায় উৎকট অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেন।

অসঙ্গতি হয়তো দুই-এক স্থানে ছিল, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত বেশী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক শিল্পী। শ্রুতি-মাধুর্য্যের জন্য কত জায়গায় যে তিনি ভাষা সংশোধন করেছেন, তার নিদর্শন আছে তাঁর পত্রাবলীতে।

মেঘনাদ-বধের দ্বিতীয় সর্গে প্রথমে লিখেছিলেন "আইলা তারা-কুন্তলা" ; পরে বদ্‌লে লিখলেন, "আইলা সুচারু তারা" ; বন্ধুর কাছে কারণ নির্দেশ করলেন : Now you improve the music of the line, because the double syllable ন্তু mars the strength of লা। Read : "আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি' / শর্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে।"

সংহত ভাষায় ভাবকে গাঢ় ক'রে তুলতে তিনি প্রায়ই যত্নবান্। একটি দৃষ্টান্ত : "কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি / মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে !" [মে. ব.—৩য় সর্গ] অশ্রুর সঙ্গে মুক্তা ও শিশিরের তুলনা কত সংক্ষেপে এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে ! ছন্দের কলা-কৌশলে ভারতচন্দ্রের দক্ষতা সামান্য ছিল না। কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যরীতি অনুশীলন করে আরও নূতন রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর এবং যুক্ত অযুক্ত ব্যঞ্জনের নিপুণ বিন্যাসে তিনি যে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রেছিলেন, তার অনুরূপ পুরোনো বাংলা সাহিত্যে কোথাও কিছু নেই। কোমল লালিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিরল নয়, কিন্তু

গাম্ভীর্য-সৃষ্টির এমন নিদর্শন সেখানে অনুপস্থিত। "অলঙ্ঘ্য সাগর-সম রাঘবীয় চমূ / বেড়েছে তাহারে"—এখানে অলঙ্ঘ্য শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জন, পূর্বস্বরের দীর্ঘায়ন, সাগর ও রাঘবীয়—দু'টি শব্দের আ-কার এবং দীর্ঘ-ঈ-কার যে তরঙ্গ-সঙ্গীত ও সাগর-বিস্তারের ব্যঞ্জনা এনেছে, তা অতুলনীয়। ভাবানুসারী ধ্বনির এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে তাঁর কাব্যে।

"তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী / কল্লোলিল বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।" [মে. ব. ২য় সর্গ]

> "বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
> স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি'
> ভীষণ মুদগর শুণ্ডে ; বাহিরিল হ্রেষে
> তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা ধাইয়া
> চামর অমরত্রাস ; রথীবৃন্দসহ
> উদগ্র সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
> বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
> জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে।"
>
> [মে. ব. ৭ম সর্গ—'শক্তিনির্ভেদ']

যুদ্ধযাত্রার বিপুল সমারোহ এবং ক্ষিপ্র গতি মূর্ত হয়ে উঠেছে এ বর্ণনায়। আর, লক্ষণীয় শব্দ-সজ্জা। অন্ত্যমিলের পরিবর্তে সুমিত অনুপ্রাস ও যমক এনেছে চমৎকারিত্ব। ছত্রশেষে পূর্ণ যতি নেই ; ভাব প্রসারিত হয়েছে পরবর্তী পংক্তিতে, এনেছে প্রবল প্রবাহ।

সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য নিয়ে তৎকালীন সমালোচকেরা কেউ কেউ কটাক্ষ ক'রেছিলেন। কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগী বলিষ্ঠ-ভাষা সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।" [আধুনিক সাহিত্য : বিহারীলাল। পৃ. ২৯]

ভাষা ও ছন্দের নব রূপ নির্মাণই বোধ হয় মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর অমিত্রাক্ষরের অনুকরণ অনেক হয়েছে, কিন্তু কোনটিই উৎকর্ষে সম-মানের হয়নি। তা ছাড়া ঐ অমিত্রাক্ষর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে পরবর্তী কালের প্রবহমান পয়ার, গৈরিশ ছন্দ এবং বলাকার মুক্তক ছন্দ। ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাসের প্রসঙ্গে নিশ্চয় আমরা লক্ষ্য করব রাবণের যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায় যুক্তাক্ষরের বাহুল্য, আবার অশোক বনে বন্দিনী সীতার চিত্রে যুক্তাক্ষর-বিরল কোমল শব্দাবলীর প্রয়োগ।

'বীরাঙ্গনা'র প্রেম-পত্র-রচনায় অমিত্রাক্ষর নূতনতর রূপ নিয়েছে। অভিমান, আর্তি

বা বিরহ প্রকাশের, পক্ষে যে ভাষা স্বাভাবিক, সেখানে তারই প্রয়োগ। যেমন, 'শকুন্তলা-পত্রিকায়'—"কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি / শুনি যদি পদশব্দ।" 'কেকয়ী-পত্রিকায়':

"বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,
(এত যে বয়েস ; তবু লজ্জাহীন তুমি),
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ। এ সবারে ল'য়ে
কর ঘর নরবর, যাই চলি আমি।"

আবার, 'সূর্পণখা-পত্রিকা'য়:

"লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে,
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস গুণনিধি,
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি' হে দু'জনে।"

শুধু অমিত্রাক্ষর নয়, মিত্রাক্ষরেও নব নব রূপ উদ্ভাবনে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার প্রমাণ বর্তমান। তাঁর অমিত্রাক্ষর পয়ার-ভিত্তিক, চতুর্দশপদীও তাই। মিল-বন্ধনের কলা-কৌশলে তিনি সনেটের বৈশিষ্ট্য এনেছেন চতুর্দশপদী কবিতায়। ভাবের ও ভাষার গাঢ়তায় কোন-কোন অংশ অসাধারণ। যেমন, 'শ্মশান' কবিতায়:

"জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি'।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্রপুঞ্জে, আয়ুকুঞ্জে কাল, জীবরাশি
উড়ায়ে এ নদ-পারে তাড়ায় তেমতি।"

'নূতন বৎসরে':

"ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে,
নাহি যার কেশপাশে তারা-রূপ মণি।"

প্রয়োগ-কৌশল যতই থাকুক, কেবল শব্দযোজনাতেই প্রকৃত কবিত্ব নয়, এ বিষয়ে তিনি সচেতন। কবি কে? "শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন"—সে নয়।

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানুপ্রভা-সদৃশ বিতরি'
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।" ['কবি'। চ. ক.—১৬]

কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা নিরাশার আন্তরিক প্রকাশ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। অধিকাংশের রচনাস্থল ফ্রান্সের ভের্সাই, কিন্তু দেশের ছবি, দেশের স্মৃতিই কবির মন জুড়ে আছে। শৈশবে-দেখা কপোতাক্ষ নদ, শিবমন্দির, বটবৃক্ষ, বিজয়া দশমী, দেব-দোল, শ্রীপঞ্চমী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পাটনী, আর তারই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি,—এই হ'ল কবিতাগুলির বিষয়।

বিভিন্ন গীতি ও নীতি-কবিতায় তিনি ছন্দ-রচনায় যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তা অবধান-যোগ্য। 'ব্রজাঙ্গনা'র ললিতভঙ্গী কখনও কখনও জয়দেব ও ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চরণান্তে পঞ্চমাত্রিক পর্বের দোলা মধ্যযুগীয় কাব্যে বিরল। ভারতচন্দ্রে পাই : "কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে, / বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।" 'ব্রজাঙ্গনা'য় আছে ঈষৎ অন্যরূপ, কিন্তু অমনি দোল-লাগানো ছন্দ :

> "কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি, ভরিয়া ডালা,
> মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী তারার মালা ?
> আর কি যতনে কুসুম-রতনে ব্রজের বালা ?" [ব্র. ৮। 'কুসুম'।]

আধুনিক পাঠকের হয়তো মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের

> "বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর,
> মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।"

মধুসূদনের কবিতাটিতে আর একটু নূতনত্ব আছে, পর পর তিন চরণে অন্ত্যমিল। সাধারণতঃ দুই চরণের অন্ত্যমিলে আমরা অভ্যস্ত।

লঘু লালিত্যের দৃষ্টান্ত আরও আছে 'ব্রজাঙ্গনা'য়। "পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল, উছলে সুরবে জল, চল লো বনে। / চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজ-রমণে।" [ব্র. ১৮। 'বসন্তে'।]

অবশ্য, এ জাতীয় ছন্দ-হিল্লোল বৈষ্ণব পদাবলীতে অপরিচিত নয়।

'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবির অকৃত্রিম মর্মবাণী, সে-যুগের দু'টি উল্লেখ-যোগ্য গীতি-কবিতা।

নীতিমূলক কবিতাগুলি নিয়ে বেশী আলোচনা হয়নি। কিন্তু ছন্দঃ ও প্রকাশ-রীতির দিক্ থেকে এদের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। 'বলাকা'য় যে মুক্তক বা অসমমাত্রিক চরণের ব্যবহার লক্ষ্য করি, তার পূর্বাভাস হয়তো এইখানে।

> "ঘুচাও কলঙ্ক, শুভঙ্করি,
> পুত্রের কিঙ্কর আমি, এ মিনতি করি
> পা দু'খানি ধরি'।" [ময়ূর ও গৌরী]

অথবা,

> "একটি সন্দেশ চুরি করি'
> উঠিয়া বসিলা বৃক্ষোপরি
> কাক হৃষ্ট মনে।

সুখাদ্যের বাস পেয়ে
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে।" [কাক ও শৃগালী]

কিংবা,

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুইজন।
দূর দেশে যাইতে হইল,
দু'জনে চলিল।
ভয়ানক পথ, পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দুল তাহে গর্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে,
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে। [গদা ও সদা]

পংক্তিগঠনের বৈচিত্র্যে এসকল স্তবক স্পষ্টতঃ মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের—

"কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী" [দুই নারী। বলাকা।]

অথবা,

"হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল,
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।" [চঞ্চলা। বলাকা।]

'মেঘনাদ-বধ' তাঁর সর্বপ্রধান রচনা ব'লে প্রসিদ্ধ, এবং এ কাব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কম হয়নি। তাঁর সময়ে অভিযোগ ছিল, তিনি পৌরাণিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদকে বড়ো করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের সমালোচনায়ও সেই ত্রুটিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল : "মেঘনাদ-বধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।" এ কালে বুদ্ধদেব বসুও মেঘনাদ-বধ কাব্যের মহত্ত্বকে একটা 'দুর্মরতম কুসংস্কার' বলে কটাক্ষ করেছেন। অথচ এ কাব্য আজও তার গৌরবের স্থানে 'অচলপ্রতিষ্ঠ'। তার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায় সে সত্যের স্বীকৃতি আছে।

"মেঘনাদ-বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি-ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন।…যে ধর্মভীরুতা সর্বদা কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ—আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান।… অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, … তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতে হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।"

কবিরা পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজ থেকে রস আহরণ করেন এবং নিজেদের মনঃপ্রকৃতির অনুসরণ করেন। যে-যুগে ত্যাগ তিতিক্ষা বৈরাগ্যের আদর্শকে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে আমরা পৃথিবীকে ভোগ করবার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, সেই যুগে আমাদের কবি,—বিশেষ ক'রে যে-কবি শক্তি ও ঐশ্বর্যের স্বপ্নে বিভোর,—যদি প্রাচীন ত্যাগমন্ত্র শোনাতে চাইতেন, তবে তা আন্তরিক হ'তনা এবং সম্ভবতঃ আমাদের তেমন আকৃষ্ট ক'রত না। মধুসূদন সত্যকার কবি ব'লেই মনের সঙ্গে ছলনা করেননি। আর, রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্রের মহিমাও সম্পূর্ণ পুরাণ-বিরোধী নয়। তাঁদের আদর্শকে শ্রেয়ঃ বলে স্বীকার না করলেও তাঁদের শৌর্য বীর্য জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় স্বয়ং বাল্মীকিই দিয়ে গেছেন।

দোষ-ত্রুটি বিচার ক'রতে বসে যা-ই বলিনা কেন, বর্তমান যুগের তিনিই যে পুরোধা এবং তাঁর প্রতিভা যে একই সঙ্গে যুগন্ধর এবং যুগাতিশায়ী, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, নাটকে নূতন নূতন সৃষ্টির ঐশ্বর্যে তিনি সকলকে চমকিত ক'রে দিয়েছিলেন প্রধানতঃ তিনটি বছরের মধ্যে। ১৮৫৯—'৬২ র মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'তিলোত্তমা-সম্ভব', 'মেঘনাদ-বধ', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী'। পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', গদ্যে রচিত অসম্পূর্ণ ইলিয়াড্-কাহিনী 'হেক্টর-বধ' এবং একখানি নাটক 'মায়া-কানন'। আর দু'একটি অসম্পূর্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু বোঝা যায়, ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর জীবন থেকে জোয়ারের জল স'রে গেছে।

স্থায়ী সাহিত্যরূপে গণনীয় না হ'লেও ইংরেজী কাব্যে এবং অনুবাদে তাঁর প্রতিভার আর-একটি দিক্ উন্মোচিত। ভাষা আয়ত্ত করবার ক্ষমতা যে তাঁর কত আশ্চর্যজনক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে চিঠিপত্রে। ২৪ বছর বয়সে যখন বাড়ী ছেড়ে মাদ্রাজে গিয়ে কোনমতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন, তখনও স্কুলের কাজ, সাময়িক পত্রের লেখা ইত্যাদির সঙ্গে রোজ রুটিন ক'রে পড়েছেন হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত। আবার যখন ফ্রান্সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বিব্রত, ঋণের দায়ে কারা-বাসের আশঙ্কা, তখন বন্ধুকে জানাচ্ছেন: "ফরাসী আয়ত্ত করেছি, ভালোই বলতে পারি, লিখতে পারি আরও ভালো। ইটালিয়ান এবং জার্মানও শিখছি। ইউরোপ ছেড়ে যাবার আগে স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজও শেখবার ইচ্ছে আছে।"

কবি-মন নিয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন, কাব্যস্বপ্নই তাঁকে আমরণ আকুল ক'রেছে; রূঢ় বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে কোনদিন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। শেলির বেদনা বেজেছিল তাঁর কবিতায়—"I fall upon the thorns of life, I bleed." মধুসূদনেরও হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠেছিল হাহাকার: "আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।"

তাঁর জন্মদিন থেকে দেড়শ' বছর আজ অতিক্রান্ত। দুঃখক্লিষ্ট অভিমানী কবিকে তাঁর দেশ ভোলেনি। গঙ্গাতীরে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি, পদ্মাতীরে, কপোতাক্ষ-তীরেও তাঁর স্মৃতি আজও অম্লান। একটি বাসনা তাঁর পূর্ণ হয়েছে, বঙ্গভূমির 'মনঃ কোকনদ মধুহীন' হয়নি, কোনদিনই হবেনা।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, ১৩৮০ পঠিত।)

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ সাত ॥

মধ্যযুগ বলতে আমরা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছি। যদিও এই কালবিভাজন অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক ও রাজনৈতিক ইতিহাস-নির্ভর, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এরকম কোন সন্ধিপর্ব লক্ষ্যগোচর নয়, তবু সাধারণভাবে একথা হয়ত বলা চলে যে বাঙলার রাজনৈতিক যুগপরিবর্তন ক্রমশঃ সামাজিক পরিবর্তনের প্রবর্তক হয়েছিল এবং সকলেই জানেন যে শিল্প ও কারুকলার পরিবর্তন সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বহুদিন পর্যন্ত এই মধ্যযুগ প্রাচীন ঐতিহ্যকেই বহন করে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুস্তরে মুঘলদরবার থেকে আগত বিবিধ প্রভাবকে আত্মসাৎ করে সেই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করার প্রস্তুতিও চলেছে তলায় তলায়। এই বিস্তীর্ণ কালের মধ্যে আবার প্রাক্‌চৈতন্যযুগকে অন্ধকারযুগ বলা চলে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বন্ধ্যাত্বের জন্য। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাঙলার যে নবজাগরণ দেখা দেয়, সমসাময়িক সাহিত্যে অলঙ্কারের বহুল বর্ণনায় মনে হয় মানুষের সৌন্দর্যসাধনার অঙ্গস্বরূপ প্রসাধনচর্চার এই শাখাটি তা থেকে বাদ পড়েনি।

এই যুগের অলঙ্কার সম্পর্কিত উল্লেখের উৎস মুখ্যতঃ দুটি—মঙ্গলকাব্য সমেত সাহিত্য এবং বৈদেশিক বিবরণ। এ-ছাড়া বাদশাহী দলিল ও ইতিহাস আছে। প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্মে সনাতন অলঙ্কারের পুনরাবৃত্তিই যেন শুনতে পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, মনসামঙ্গল (যথাক্রমে পুরুষোত্তম, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, গঙ্গাদাস সেন, কেতকাদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজরসিক প্রণীত), দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য (যথাক্রমে মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ ও ভবানীশঙ্কর দাস প্রণীত), রামায়ণ (কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য প্রণীত), কাশীরাম দাসের মহাভারত ও শঙ্কর দাসের ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যেসব অলঙ্কারের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় তার একটা তালিকা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে : ১) শিরোভূষণ—সিঁথি, (রত্ন) মুকুট, সোনার চিরুনী, কনকফুল, কনকচাঁপা, ঝাঁপ ও পঞ্চফুল। ২) কর্ণাভরণ—কুণ্ডল, কর্ণফুল, কানবালা চাকা ও বলি বা চাকি বৌলি, হীরাধর কড়ি, বীর বৌলি, মাকড়ি। ৩) নাসিকাভরণ—বেসর বা বেশর। ৪) কণ্ঠাভরণ—হার, গ্রীবাপত্র, সাতেসরি বা সতেশ্বরি বা সাতলহর হার, মুকুতার বলী, কণ্ঠমাল, সুতলি হার, গজমুক্তার হার, সুবর্ণের পাঁতিহার ও সরস্বতী

হার। ৫) বাহুভূষণ—অঙ্গদ, কেয়ূর, বাজু বা বাজুবন্ধ, মাদুলি ও তাড়। ৬) নিম্নবাহু-ভূষণ—রত্নচূড় (ওপরের অংশের নাম সরল, মধ্যাংশ চূড় এবং সামনের দিকের নাম কঙ্কণ), বালা, বলয় ও চুড়ি, কনক বাহুটি, শঙ্খ (বিভিন্ন রূপান্তরের নাম লক্ষ্মীবিলাস, রামলক্ষ্মণ, গজদন্ত ইত্যাদি)। ৭) অঙ্গুষ্ঠাভরণ—আঙ্গুঠী, রামুদড়ী, রত্ন অঙ্গুরী ও সুবর্ণ অঙ্গুরী। ৮) পৃষ্ঠভূষণ—থোপনা। ৯) কটিভূষণ—কিঙ্কিণী, ঘাঘর, নীবিবন্ধ ও রশনা। ১০) পদাভরণ—খাড়ু, মগর বা মকরখাড়ু, মল্ল-তোড়র, বাঁকপাতা মল, উঁছট বা উঙ্খটিকা বা পাশুলি, নূপুর ও ঘুঘুর।

কিছু কিছু বৃত্তিমূলক অলঙ্কারের উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে মেলে। যেমন, যোদ্ধার অঙ্গে থাকত রণটোপ, টোপর বা হেলমেট, তাড় বা আর্মলেট, বালা বা ব্রেসলেট, নূপুর ও কিঙ্কিণী। ব্যাধের গলায় ঝুলন্ত লোহার কাঠির মালা, তাতে থাকত বাঘনখের পেণ্ডেন্ট আর কানে থাকত স্ফটিকের কানফুল। রাখাল ছেলেরা পরত তাড়, বালা ও কুণ্ডল, বনফুলের মালা, বিশেষ করে গুঞ্জার মালা ছিল তাদের খুব প্রিয়। চন্দনের অলকা-তিলকা কাটতেও তারা খুব উৎসাহী ছিল। যোগী কিংবা যোগিনীকে চেনার সব চাইতে সহজ উপায় ছিল এই যে এঁরা তামার তৈরী কুণ্ডল পরতেন কানে। চাঁদ সদাগরের মত বিলাসী বণিকেরা রজত-পাদুকা ব্যবহার করতেন। মুসলমান রাজপুরুষেরা বাঙালী ও অবাঙালী উভয় প্রকারের নর্তকী ও গায়িকাদের সমাদর করতেন, তার মধ্যে আবার এঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন লুলিয়ানী ও কলাবন্তরা। পৃথক পল্লীতে বাস করলেও বারবনিতাকুলও এই শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। নটী ও নর্তকীকুল রঙবেরঙের পোষাক পরে ফুলসাজে সেজে নানাবিধ অতিমূল্যবান্ অলঙ্কার পরত। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সেই সেনযুগের বাররামা ও দেবদাসী জাতীয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাধন্য সভা-কামিনীদের সময় থেকে মধ্যযুগের নর্তকী, বাঈজী ও নটীদের মধ্য দিয়ে সবশেষে ভাঙ্গা নবাবী আমলের শহরের বারবনিতারা অলঙ্কার, প্রসাধন ও সাজসজ্জার ব্যাপারে সমাজে রুচি পত্তনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।

কৃষ্ণকীর্তনে সোনা, হীরে এবং অন্যান্য রত্নপ্রস্তরের যে উল্লেখ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে সবিশেষ সামাজিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। 'দই চাই' বলে হেঁকে যায় যে গোয়ালিনী রাধা, তারও হাতে সোনার চুবড়ী, রূপোর ঘড়ী। খাট-পালঙ্ক তাও সুবর্ণমণ্ডিত। তবে সাধারণভাবে মধ্যযুগে বিত্তশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রদের তুলনায় অলঙ্কারের পেছনে ঢের অর্থব্যয় করতেন, প্রভূত পরিমাণে সোনার গহনা ও হীরা-জহরৎ ব্যবহার করতেন। ধনীর দুলাল মাত্রেই মূল্যবান গহনা পরত, পায়ে মগর-খাড়ু ছাড়াও পরত রত্নখচিত হার, বালা, তাড় ও কর্ণাঙ্গুরী। সাধারণ গৃহস্থকে অবশ্য কম দামের এমনকি শাঁখের গহনা পরে সাধ মেটাতে হত। কাঁসা ও কলাইকরা গহনা, রূপোর বলি, তামার মল এবং হাতীর দাঁতের আংটিতে সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

এ সময়কার বিদেশী পর্যটকের বিবরণীর মধ্যে ইবন বতুতার কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর বিবরণীর আরেক জায়গায় দেখা যায়, এদেশ থেকে তখন সোনা, রূপো ও লোহা রপ্তানী হত। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত ভেনিসীয় বণিক নিকলো কন্তি জানাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপো, মূল্যবান্ রত্নপ্রস্তর ও মুক্তো পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ বণিক দুয়ার্তে বারবোসা বলেছেন যে সম্ভ্রান্ত মুর বা মুসলমানরা কোমরে রাখে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত ছোরা ও আঙ্গুলে পরে রত্নখচিত আংটি। এঁদের অন্তঃপুরিকারা রত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার পরেন। পঞ্চদশ শতকের চীনা পর্যটক শিঙ চা শেঙ লান্ দেখেছিলেন যে মুসলমান রমণী প্রস্তরখচিত স্বর্ণনির্মিত মাকড়ি কানে পড়ত, গলায় ঝুলত পেণ্ডেন্ট। কব্জী ও গোড়ালিতে থাকত সোনার ব্রেসলেট, হাতে ও পায়ের আঙ্গুলে আংটি। ষোড়শ শতকের আর এক চীনা পর্যটক শি ইয়াঙ্ চাও কুঙ্ তিয়েন্ লু একই রকম বর্ণনা রেখে গেছেন। ঐ সময়কার ব্রিটিশ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্ বাকলা অঞ্চলে মেয়েদের রূপোর বলি এবং রূপো, তামা ও হাতির দাঁতের অন্যান্য অলঙ্কার পরতে দেখেছেন। প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে টমাস বাউরে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে হীরা ও মুক্তাখচিত সোনা ও রূপোর অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। ফরাসি পরিব্রাজক জে. বি. ট্যাভার্নিয়ের ঢাকা ও পাটনায় দেখেছিলেন দু' হাজারের বেশি কারিগর পাথরের জিনিস বানাচ্ছে, তার মধ্যে কচ্ছপের হাড় ও সামুদ্রিক প্রাণীর হাড় দিয়ে তৈরি ব্রেসলেট ও প্রবালের মাল্যদানা আছে। শেষোক্ত বস্তুগুলি ত্রিপুরা ও আসামে রপ্তানী হত তার বিনিময়ে ত্রিপুরা থেকে আসত নিকৃষ্ট মানের সোনা। ত্রিপুরা আবার চীনে সোনা রপ্তানী করে রূপো নিয়ে আসত। রিয়াদ-আল্-সলাতিন এবং তারিখ-ই-ফিরিশ্তাহ্ অনুসারে, বাঙলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সোনার থালায় খেতেন, এক সময়ে উৎসব-পার্বণে কে কতগুলো সোনার থালা বার করতে পারেন তাই দিয়ে সামাজিক মর্যাদার বিচার হত। এইভাবে পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিছিন্ন না হয়েই বাঙলার মধ্যযুগীয় প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার ধীরে ধীরে তৎকালীন সর্বভারতীয় ফ্যাশনের অগ্রগতির তাল মেলাতে চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে দেশীয় ভূস্বামী, বিদেশী শাসককুল, বাঈ ও নর্তকীবৃন্দ এবং বণিক-সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

॥ আট ॥

আধুনিক যুগ ও উপসংহার

সর্বভারতীয় অলঙ্কারশিল্পের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশের আলঙ্কারিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক আমাদের আলোচ্য ছিল। বাঙালীর চিত্ত বরাবরই সনাতন ভারতীয় ধারানুযায়ী স্বভাবতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। তবে এখানকার আর্দ্রোষ্ণ জল-হাওয়া,

নরম মাটি, সুকুমার রুচি, সংবেদনশীল শিল্পানুভূতি ও সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে অলঙ্কারশিল্পের বিকাশ কালক্রমে সর্বভারতীয় রীতি থেকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এমনটি কল্পনা করা সঙ্গত নয় যে, অলঙ্কারশিল্পের এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী ঈষৎ স্বতন্ত্র বিবর্তনের ধারাটি মূল সর্বভারতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙলার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতর বাঁক নিয়ে সর্বদা দ্রুতগতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে প্রবলতর স্বাতন্ত্র্যযুক্ত চেহারা নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখিয়েছে। ইতিহাসে সাধারণ ও স্বতন্ত্র•এই দুটি রূপই পাশাপাশি ও পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময় দেখা যায়, তদুপরি সেই স্বাতন্ত্র্যও কদাচ মুখ্যস্বরূপে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বাঙলার অলঙ্কারের প্রকৃত রূপ হল, সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর পাঁচটি অনুরূপ জনপদের সাহচর্যে বিলীন একীভূত একটি মূর্তি যার গায়ে মাখানো আছে এক অনিবার্য, অনির্দেশ্য আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রলেপ। অলঙ্কারের জগতে প্রকৃত যুগান্তর এক লহমায় ঘটেনা, তার অন্তরালে একযোগে যদিচ ভিন্নগতিতে কাজ করে চলে দিক পরিবর্তনের প্রবণতাসম্পন্ন কার্যকারণসমূহের বিচিত্র ও জটিল সমাবেশ। সামাজিক, আর্থনীতিক, শৈল্পিক, নান্দনিক, ধর্মীয় বা আচারগত পরিবর্তনের নানাবিধ গূঢ়সঞ্চারী যৌথ রাসায়নিক চাপে সমাজের অলঙ্কারভাবনায় ধীর, অলক্ষ্যগতিতে যুগপরিবর্তনের আয়োজন চলতে থাকে। অন্যান্য কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি পুরাতনকে কদাচিৎ নিঃশেষে বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত করে দিয়ে নবীনের আবির্ভাব ঘটে। অলঙ্কাররুচির ক্রান্তিপর্বে বহিরাগত বা অন্তঃপরিণত নবীন প্রভাবকে স্থান করে দিতে গিয়ে সনাতনকে অল্পবিস্তর ভাঙতে হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সুকৌশলে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনের অভিষেক হয়। বিবর্তনের ধারায় নব নব উন্মেষ সত্ত্বেও ঐতিহ্যের এই নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্নতা শুধু বাঙলা নয় সারা ভারতের অলঙ্কারশিল্পের চরিত্রে নানা বহিরঙ্গ পরিবর্তনের সাময়িক চাঞ্চল্যকে অতিক্রম করে এক উত্তুঙ্গ সনাতন স্থৈর্য, ঐক্য ও সমতা আরোপ করেছে। বাঙলাসমেত ভারতের সর্বত্র আকরস্থানীয় অলঙ্কারগুলির মৌলরূপ প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি একই রয়ে গেছে, যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে তা মুখ্যতঃ ঐ আকরসম্ভারের সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিদেশাগত নব নব রীতিপদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে মিশ্ররীতির উদ্ভব- দেশী বিদেশী বিবিধ নকশা ও মোটিফের পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা নতুন সংযোজনের সাহায্যে সামান্য রকমফের এবং সর্বোপরি পুরাতন অলঙ্কারের নতুন নতুন নামকরণ।

বাঙলার আলঙ্কারিক স্বাতন্ত্র্যের এবম্বিধ লক্ষণ স্মরণে রেখে বাঙালীর নিজস্ব অলঙ্কার বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর গহনাকে বোঝায় কিনা, বোঝালে তা কোন্‌গুলি, বিবর্তনের ধারায় ঠিক কোন্ পর্বে এসে এবং কেন এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধেছে এবং কতিপয়

অলঙ্কারকে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে—এই ধরণের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর পাওয়া যায় কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। বস্তুতঃ যে অর্থে আমাদের আরো কয়েকটি মুখ্য চারু ও কারুশিল্প সর্বভারতীয় পটভূমিকায় নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক খ্যাতি অর্জন করেছে, সে অর্থে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কোন বাঙালীয়ানার সন্ধান বাতুলতা। কারণ এক্ষেত্রে বাঙালীর নিজস্ব প্রতিভা ও কল্পনা কাজ করেছে অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্বাধীন প্রেরণার সঙ্গে। পটচিত্রের ক্ষেত্রে যেমন সর্বভারতীয় উৎকর্ষের নির্বাচনাত্মক স্বীকরণ সত্ত্বেও এক আশ্চর্য স্বতন্ত্র নৈপুণ্য, মেজাজ ও শিল্পবোধ বাঙলার এই চিরন্তন লোকশিল্পকে কালক্রমে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ঘরানায় পরিণত করেছে, অলঙ্কারশিল্প কিন্তু সেরকম কোন সুনির্দিষ্ট ও পরাক্রান্ত স্বকীয়তা কোন পর্বেই অর্জন করেনি। মৃৎশিল্পে বিশেষ করে পোড়ামাটির অলঙ্করণে, সূচী ও বয়নশিল্পে, তক্ষণে বাঙলার যে অসামান্য রূপদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, ধাতু ও মণিরত্নখচিত বঙ্গীয় অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ আঞ্চলিক আভিজাত্য আমাদের নেই। এর অর্থ হয়ত এই নয় যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাঙালী স্বর্ণকাররা কম দক্ষ বা কুশলী। বরং অনুমান করা সঙ্গত যে, প্রথমতঃ অনির্দেশ্য কারণে বাঙালীর মেধা, দক্ষতা ও রুচি উল্লিখিত শিল্পে অধিকতর অভিনিবেশ করে ; দ্বিতীয়তঃ প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারের সঙ্গে যে রাজকীয় বৈভব ও সম্পন্ন রুচি অঙ্গাঙ্গী জড়িত বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে চিরকাল তার পরাকাষ্ঠা ছিল উত্তরাপথের নাগরসমাজ এবং বিশেষ করে দিল্লীর রাজদরবার। বাঙালী প্রতিভা অলঙ্কারে তাই স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা যতটা না করেছে তার চাইতে বেশি চেয়েছে উত্তরভারতীয় নাগরিক আদর্শকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে।

কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য, বাঙালী অলঙ্কারশিল্পী বিশুদ্ধরীতিতে তেমন স্বস্তিবোধ *করেননি যেমনটি করেছেন মিশ্রিতরীতির ক্ষেত্রে। মুঘল-পরবর্তী* ভঙ্গ নবাবী ও বৃটিশপর্বের প্রাক্কালে যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায় তাকে উপলক্ষ করেই বাঙালার নিজস্ব অভিজাত গহনা তার স্বকীয় রূপটি খুঁজে পায়। প্রথমতঃ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা নতুন সহুরে সংস্কৃতি ও রুচি বহুলাংশে স্থানীয় বণিক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাবুসম্প্রদায়ের নিজস্ব মর্জি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেমন পুতুলশিল্পে বণিক বৌ-ঝির মুখ আরোপ করাটা রেওয়াজ হয়েছিল তেমনি গহনার ব্যাপারেও বণিক-গৃহিণীর অলঙ্কারাভ্যাস ও রুচি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ কলকাতা সহরে যে উঠতি বাবুকালচার আসর জাঁকিয়ে বসেছিল, তা প্রকৃতপক্ষে নবাব-বাদশাহর ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যাড়ম্বরকে অনুকরণ করার দুর্বল ও অসফল প্রয়াস মাত্র। অতএব উত্তরভারতের মুসলিম বাবুসমাজ বিশেষতঃ মুঘল দরবারের বিলাস প্রকরণ ও সৌন্দর্যসম্ভোগের আয়োজন ছিল এই অপকৃষ্ট সংস্কৃতির একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এই উত্তরভারতীয় মণ্ডন ও বিলাসসজ্জার আদর্শ আগেকার

মত এই পর্বেও প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রধানতঃ বাঈ, নর্তকী ও বারবনিতা মারফৎ। এই উচ্চকোটির বারাঙ্গনা ও পেশাদার নর্তকীদের অনেকেই ছিল হয় উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম রমণী অথবা উত্তরভারতের প্রচলিত জমকালো সাজসজ্জার মুঘলঘেঁষা আদর্শে দীক্ষিত। অতএব ক্রমে এই রুচি কলকাতা শহরের বাবুসমাজে সঞ্চারিত হয়েছে। শহর কলকাতার অলঙ্কার রুচিতে তৃতীয় সংযোজন হল বিদেশী প্রভাবের আওতায় দেশী কারিগরদের নিয়মভাঙ্গা সংমিশ্রণের সাধনা। ইওরোপীয় ধারায় শিক্ষিত কারিগরদের হাতে বিমিশ্র পদ্ধতিতে রচিত অলঙ্কার বিশেষতঃ খাদযুক্ত ধাতুর গায়ে হীরেকাটা পালিশের জেল্লায় হাল্কা আপাতঃ মনোহর গহনা মধ্যবিত্তজনের প্রিয় হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল অলঙ্কারশিল্পে নবাগত অন্যান্য কারুশিল্পীর পাঁচমিশেলী সংস্কার, রুচি ও অভিজ্ঞতা।

এইসব ভিন্নধর্মী বিচিত্র প্রভাবসমূহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে কলকাতা হাওড়া, বিষ্ণুপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও অন্যত্র যে বিশিষ্ট ঘরনা জন্ম নিল, তাদের তৈরি কোন কোন গহনাকেই আমরা বাঙালীর নিজস্ব প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার আখ্যা দিতে পারি। কারিগরীর দিক থেকে ঠোকাই, ছেলা ও দানার কাজে বাঙালী কারিগর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। এছাড়া সোনা ও রূপোর জালি কাজে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার শিল্পীরা অসাধারণ উৎকর্ষ ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতানুসারে প্রাদেশিক গহনার তালিকা করতে হয় বলে মতভেদের অবকাশ এখানে যথেষ্ট। প্রায় একশো বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙালীর নিজস্ব অলঙ্কার বলতে চারটি শিরোভূষণ, পাঁচটি নাসিকাভূষণ, তেরোটি কর্ণভূষণ, বারোটি কণ্ঠভূষণ, চব্বিশটি বাহুভূষণ, দশটি কটিভূষণ, ও পাঁচটি চরণভূষণ —এই মোট বাহাত্তরটি অলঙ্কার পেয়েছিলেন। তাঁর মতে আমাদের বাকি গহনা উত্তরভারতের অনুরূপ। বর্তমানে, এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাঙালীর নিজস্ব গহনার এক তালিকা সংগৃহীত হয়েছে। এই সূত্রে বলে রাখা ভালো, এই তালিকা অনুসারে বোঝা যায় গহনার অভিধা এখানে পুরনো আছে, পরিবর্তন ঘটেছে মোটিফে, মূল কারিগরীতে এবং অন্তিমস্পর্শ পর্বে। (১) নকাশী চুড়া (২) মাথার ফুল (৩) মাথার বাগান (৪) মাথার কাঁটা (৫) চিরুণি (৬) কানঝাপ্‌টা (৭) বাঁক (৮) ঠোকাই হার (৯) হাঁসলি হার (১০) কাটাই আর্মলেট (১১) জড়োয়া চুড়া (বাঙলা ঢঙ) (১২) কাটাই চেনহার (১৩) চিক ও রিস্টলেট (১৪) কানপাশা (১৫) মিনা টাব (১৬) কাণবালা (১৭) টিকুলী (১৮) মাকড়ি (বাঙলা) (১৯) বাঙলা ইয়ারিং (২০) চৈঁড়ি ঝুমকো (বাঙলা) (২১) কান ঝুমকো (২২) মণিপুরী মাকড়ি (২৩) কাটাই মাকড়ি (২৪) চূড় (২৫) বাঙলা চুড়ি (২৬) নকাশীবালা (২৭) মণিপুরী বালা (২৮) শীল ও ডাঁটি আংটি (২৯) মানতাসা (৩০) জড়োয়া ব্রেসলেট (৩১) তাগা ও জসম (৩২) বাঙলা

পেণ্ডেন্ট—এই বত্রিশটি গহনায় এখনকার বাঙালী কারিগরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে।

লোকায়ত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বাঙলার স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তালিকা এক বিরাট ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে তাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার যেমন শাঁখা, বলি ও রুলি দিয়ে সুরু করা যেতে পারে। সোনার ধাতুক্ষয় বন্ধ করতে এবং বিবাহিতা হিন্দুনারীর হাতে বিচিত্র বর্ণ সৃষ্টি করতে শাঁখা ও রুলি একসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় শঙ্খশিল্পের আঞ্চলিক ঘরানাও সৃষ্টি হয়েছিল। বাশারেখি, কার্নিশদার, জলতরঙ্গ, হীরেকাটা এবং মকর চেহারা শাঁখা তখন বঙ্গললনার দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। এছাড়া নানারকম গাছ ও লতা-পাতার বীজ, নির্যাস, কাণ্ড, বাদাম ইত্যাদি দিয়েও লৌকিক শিল্পীরা বিচিত্র অলঙ্কার তৈরী করে নেন। এই জাতীয় লোকায়ত অলঙ্কারের কোন কোনটি অবশ্য ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত। তবু বাঙালীয়ানার দাবি অনুসারে, গাছের বীজ তক্ষণের সাহায্যে সুন্দর রূপ দেওয়ার বিবরণ আমাদের সাহিত্যে চিরকাল আছে। সেই কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ গুঞ্জা বা কুঁচ লাল সর্বজয়ার কালো বীজের সঙ্গে মিলিয়ে জপের মালা আজও গাঁথা হয়। গুঞ্জার মতই দেখতে হল রক্তবর্ণ রক্তকাঞ্চনের বীজ, যদিও ঈষৎ বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা ও কৃষ্ণবিন্দুরহিত। তবে রক্তকাঞ্চনের মালা ভারতের অন্যত্র চলে। সুগন্ধি তুলসীর বীজ ও কাঠ খোদাই করে যে কণ্ঠি বানানো হয় তা শুধু বৈষ্ণবের সাধন সহায়ক নয়, এক আশ্চর্য লোকশিল্পের নমুনাও বটে। তিসি বা মসিনা গাছের কাণ্ডের টুকরো দিয়ে রচিত নেকলেস একসময় কলকাতা থেকে রপ্তানী হত। শ্রীহট্ট অঞ্চলের 'বুড়ি' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কলসাকৃতি মটর দানা আকারের অতিকঠিন বীজকে সুকৌশলে সচ্ছিদ্র করে মালা পরানো হয় ছোটদের গলায়, এতে নাকি সার্বিক অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পদ্মবীজের মালা শুধু শিবের নয় সাধারণেরও কণ্ঠাভরণ। পুত্রঞ্জীব গাছের কালো বীচির মালা দীর্ঘজীবন কামনায় পুত্রদের গলায় পরানো হয়, ব্রাহ্মণেরাও পরেন। কাঠ ও আঠা দিয়ে নানারকম গহনা তৈরী হয়। বাসক গাছের কাঠ থেকেও সুন্দর মাল্যদানা তৈরী হয়। নিজেদের চিহ্নিত করার জন্য বেলগাছের ছাল ও কাঠ থেকে মাল্যদানা বানিয়ে ঘৃতকুমারীর আঁশের সুতো পরিয়ে মালা পরেন কেউ কেউ। শোলার টুকরা দিয়ে অজস্র গহনা তৈরি হয়। অবশ্য এ বস্তুর সর্বাধিক প্রয়োগ প্রতিমার ডাকের সাজে, কিন্তু মানুষের অঙ্গসজ্জাতে, জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তে কারো কারো কাছে এ বস্তু কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে না। সব শেষে সেই বিস্ময়কর গহনার কথা উল্লেখ করতে হয়। এককালে বাঙলার ধান্যসমৃদ্ধির চিহ্ন স্বরূপ ধানের ছড়া দিয়ে মালা তৈরির রেওয়াজ আজও বর্তমান। প্রায় শতবর্ষ আগে কলকাতায় আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বর্ধমানের গুশকরা অঞ্চল থেকে এ রকম একছড়া ধানের চেন

পাঠানো হয়েছিল, তাই দেখে শহরের দেশী-বিদেশী মহল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

সাম্প্রতিক কালে অভিজাত এবং লোকায়ত উভয় অলঙ্কার ক্ষেত্রেই অভাবনীয় পরিস্থিতি কিছু দেখা দিয়েছে। রত্নপ্রস্তর ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক এবং গহনা-দোকানে জ্যোতিষীর অবস্থান আর এক দিকের ছবি তুলে ধরছে। তবু বলা যায়, কৃতী শিল্পীর অভাব আজও এই শিল্পে দেখা দেয়নি। বাঙলার অলঙ্কার শিল্প এখনো সমাজের বিকাশের ধারা ধরেই বয়ে চলেছে।

সূত্রগ্রন্থ : (ক) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ১৯৪৯
(খ) Art Manufacturers of India by T. N. Mukharji 1888.
(গ) Census of India 1951.
(ঘ) Early Travels in India 1583—1619 by William Foster 1921.
(ঙ) Indian Jewellery by Col. T. H. Hendley 1909.
(চ) Indian Jewellery, Ornaments and Decorative designs by J. B. Bhushan 2nd ed. 1964.
(ছ) Industrial Arts of India by Sir George Birdwood 1810.

গোবিন্দচন্দ্র দাস [১২৬১-১৩২৫]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে,
পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন পূবে হওয়ায় বেরুলো নীড় ত্যেজে,
পাথর-চাপা রইলো কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইলো চোখের জলে।"

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে গোবিন্দচন্দ্রের দুঃখময় জীবনের আভাস দিয়েছেন। সত্যই তাঁর 'পাথর-চাপা রইলো কপাল' আর সারা জীবন 'বাদ্‌লা ক'রে রইলো চোখের জলে'। সংসার তাঁকে দিয়েছে তীব্র গরল, আর তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন অনন্ত অমৃত।

২

১২৬১ সনের ৪ঠা মাঘ, ঢাকা—ভাওয়াল—জয়দেবপুরে কবির জন্ম। 'জননী আনন্দময়ী, পিতা রামনাথ।'

পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। স্কুলে পাঠাবার সঙ্গতি দরিদ্রা মায়ের ছিল না। রাজা কালীনারায়ণ এই দুঃস্থ পরিবারকে কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্য দিতে লাগলেন আর রাণী সত্যভামা বালকের শিক্ষার ভার নিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে গোবিন্দচন্দ্র দু'বছর নর্মাল স্কুলে পড়েন, পরে ব্রাহ্মণগ্রামে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে হেড্‌পণ্ডিত নিযুক্ত হ'ন। সে-কাজ ছেড়ে ঢাকা মেডিকাল স্কুলে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। রাজা কালীনারায়ণের অনুগ্রহে সংসারের যেটুকু সুরাহা হয়েছিল, তাও শেষ হতে চল্‌লো। রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন, রাজ্যের এবং নাবালক পুত্রের ভার একজন উপযুক্ত অভিভাবকের উপর সমর্পণ ক'রে তিনি তীর্থযাত্রার সংকল্প করলেন। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষক ও অভিভাবক-রূপে মনোনীত হ'লেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। গোবিন্দচন্দ্র তখন রাজসরকারে সামান্য কর্মচারী।

একে দরিদ্র, তা'তে অন্যায়ের চিরশত্রু, কাজেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হ'ল না। দু'জন পদস্থ ব্যক্তি একটি অসহায় কুলবধূর সর্বনাশ করতে গিয়েছিল, বধূর স্বামী রাজার কাছে নালিশ ক'রেও উপযুক্ত প্রতিকার পেলো না। গোবিন্দচন্দ্র তখন গ্রামবাসী ইতর-ভদ্র সকলকে সংঘবদ্ধ ক'রে বললেন, রাজা কিছু না করলে বিচারের ভার নিজেদের হাতে নিতে হবে। তাঁর নেতৃত্বে বিপুল জনতা বিচারের দাবি নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের যথাযোগ্য শাস্তি দেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র তাঁদের বিষ-নজরে পড়েন।

ইতিমধ্যে রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে। যুবরাজ রাজত্ব পেয়েছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁর ম্যানেজার। প্রজার পক্ষ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে ল'ড়তে যাবার স্পর্ধা তাঁরা সইবেন না। কবিও অপমান স্বীকার করবার লোক ন'ন। তিনি জমিদারির কাজে ইস্তফা দিলেন।

সংসারের দায় আছে। পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল সারদাসুন্দরীর সহিত। দু'টি কন্যাও সংসারে এসেছে, প্রমদা ও মণিকুন্তলা। পত্নীগতপ্রাণ সংসার-প্রেমিক কবিকে এখন থেকে অনেক দিন জীবিকার সন্ধানে বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়েছে—ঢাকা, সেরপুর, ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর—নানা স্থানে। অনেক দিন দু'বেলা আহার জোটেনি, দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয়েছে। মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর এবং সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজা কমলকৃষ্ণ তাঁর কবিতার অনুরাগী ছিলেন, মধ্যে মধ্যে কবি তাঁদের আনুকূল্য পেয়েছেন, কিন্তু বেশী দিন এক জায়গায় টিঁকে থাকা তাঁর কোষ্ঠীতে ছিল না।

পত্নী সারদার কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি সেরপুর থেকে জয়দেবপুর রওনা হ'ন। অন্তিম কালে ক্ষণেকের জন্য দু'জনের দেখা হ'ল (ইং ১৮৮৫)। এই সারদাকে নিয়ে তাঁর কত স্বপ্ন, কত মান অভিমান অজস্র কবিতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিদেশে বিদেশে ঘুরে দৈন্য ঘুচাবার কত চেষ্টা করেছেন কবি, পারেননি, তাই কি দুঃখিনী রাগ করে চলে গেল? অভিমানিনী সে, মুখ ফুটে কারও কাছে কোনদিন কিছু চায়নি!

"যাও না পরের কাছে, যাহা আপনার আছে—
কভু কর উপবাস, কভু একাহার,
অভাগিনী অশ্রুমুখী দুখিনী আমার।"

৩

রাজপুরুষদের চক্রান্তে একদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘর বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, তিনি নির্বাসিত হ'লেন, গভীর রাত্রে কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। তখনকার মত বাঁচলেন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে গুপ্তঘাতকের হাত থেকে সতর্ক এবং সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছে।

এদিকে, সারদার মৃত্যুর পরেই তাঁর একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্র লোকান্তরিত হ'লেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আগেই মারা গিয়েছিলেন। শোকে তাপে জর্জরিত কবি একদিন কলকাতায় রাজার সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর ভুল শোধরাবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ'লেন। তখন তাঁর লেখনী অগ্নিবর্ষণ করতে ছাড়লো না। 'মগের মুলুক' কাব্যে তিনি ভাওয়ালরাজ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কীর্তিকাহিনী অনাবৃতভাবে বর্ণনা করলেন। রাজপুরুষেরা আইনের সাহায্য নিয়ে বইখানি বাজেয়াপ্ত করেন। যে-কবি বলেছিলেন "ভাওয়াল আমার,

অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ", তাঁকে ভাওয়াল থেকে চিরবিদায় নিতে হ'ল। দেশবাসীর ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে দুঃখতাপজর্জরিত কবি অভিমানভরে সেদিন বলেছিলেন, "ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ?"

৪

সারদার মৃত্যুর সাত বছর পরে তিনি ব্রাহ্মণগ্রামের মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা প্রেমদাকে বিবাহ করেন। প্রেমদাকে পেয়েও সারদাকে তিনি ভুলতে পারেননি। দু'জনার প্রেমের যুগ্ম আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে 'সারদা ও প্রেমদা' কবিতায়।

"প্রেমদা পদ্মার কূলে কোমল শেফালি-ফুলে
করিয়া বাসরশয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা 'চিলাই'-তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।
নাহি নিশি নাহি দিন দু'জনেই নিদ্রাহীন
দুই-দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী পানামা-যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙে নামি দু'জনার বানে।" (কস্তুরী)

৫

এই প্রেমদারই ছোট ভাই অতুলের মৃত্যু নিয়ে একটি অসাধারণ মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন গোবিন্দচন্দ্র। তার মৃত্যুর তারিখ ২৫শে আশ্বিন, ১৩০০ সাল। কবিতাটি পড়তে পড়তে দু'এক জায়গায় হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস'-এর কথা মনে পড়বে পাঠকের, তবে, সম্ভবতঃ সেটি এর পরে লেখা। দু'টি রচনায় দুই কবির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের ভাষা শাণিত মার্জিত, গোবিন্দচন্দ্রের যেন স্বভাব-নিঃসৃত; অভিজাত কারুকলা হয়তো এখানে নেই, কিন্তু আছে এক ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত আদিম শক্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত অনুভূতি, যার প্রভাব অমোঘ।

দশ বছরের বালক অতুল—অভাগিনী মায়ের 'চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা'—ঢাকায় মামাদের কাছে থেকে পড়ে, ছুটির পরে ফিরে যেতে হবে সেখানে; মায়ের আঁচল ধরে কেবলই বলতে লাগলো—"যাবো না মা, যাবো না।" মামারা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৌকোয় তুলে নিলেন।

"ভাদর—তেরো শ' সন,—চারি দিকে জল,
বিশাল বরুণরাজ্য হাসিছে কেবল
বিরাট্ তরঙ্গভঙ্গে।"

যাত্রার সময় এলো। অপরাহ্নকাল। আকাশে গাঢ় মেঘের সঞ্চার।

"কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা।

রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ডপ্রায়
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।"
"কি বিশাল লম্ফঝম্প, বিশাল গর্জন,
বিকট ভ্রূকুটিভঙ্গে করে আক্রমণ,
পড়ি' তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে।"

অদ্ভুত বলিষ্ঠ এ বর্ণনা—অপ্রত্যাশিত উপমায় সমগ্র চেতনাকে চমকিত ক'রে তোলে।

"একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
মমতার পুরুভুজ, সে কি কভু মরে ?
একভুজ কাটো যদি, শতভুজ ধরে।"

"দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়"—এই পংক্তিটির মত এমন মর্মান্তিক সত্য চিত্র সাহিত্যে বেশী আছে কিনা জানি না।

মাতা পুত্র দু'জনেরই চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

"উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল।
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাত।"

এই তাদের শেষ বিদায়।

পূজার দিনে অতুল আসবে, মা আশা করে বসে আছেন। শুক্লা ষষ্ঠী। 'শিশু শশধর'কে কোলে নিয়ে সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এলেন সুন্দরী রাত্রি। পাড়ার মেয়ে 'তারাসমুদয়' নবজাতককে দেখতে এলো। ঘরে ঘরে উৎসব।

"ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ, কেবল মিলন,
জননী স্নেহের আজ মহা-উদ্বোধন।"

কিন্তু কোথায় অতুল ?

"একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে,
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল।"

মায়ের মনে আশঙ্কার অন্ত নেই।

"ডাকিছে নিশার কাক, সে-ও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে, নীচে কাঁপে জল।"

দেখতে দেখতে পূজার তিন দিন কেটে গেল।

"বিজয়ার বিসর্জন উৎসব নীরব।
কোলে নিয়ে জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব, শিরে দূর্বাধান।
সকলে পেয়েছে বুকে বুক-ভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ?"

পৃথিবীর চোখে ঘুম। "একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই।"

"চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

* *

ভোর হয়ে এলো। মায়ের মনে হ'ল, অতুল এসেছে, তাঁকে মা বলে ডাকছে।

"অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া।
চীৎকারে, অতুল মোর আসিতেছে অই।
খুঁজিতে উড়িল কাক, কই কই কই?
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িল জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি।" [কস্তুরী : 'অতুল'।]

নির্মম নিয়তির এ আঘাত আমাদের মর্মে মর্মে বাজে। অকৃত্রিম আবেগ ভাষায় অলঙ্কারে কি অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার ক'রতে পারে, তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাই এ কবিতায়।

৬

আর একটি অসামান্য কবিতা 'শ্মশানে নিশান'—মহাকাব্যের মহিমাদীপ্ত অপূর্ব গীতি কবিতা।—ক্লাসিক কল্পনায় রোমান্টিক সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

"শ্রাবণের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার।"

"নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশানকালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার।
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জ্বলা
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খমালা।"

ব্রহ্মপুত্র ভয়ে মসীবর্ণ। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। এহেন সময়—"উড়িছে আকাশে এক ধবল নিশান।"

"শ্মশানে নিশান কেন? হাসে খলখল
মড়ার মাথার খুলি বিকাশিয়া দন্তগুলি
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল।

সবে করে উপহাস ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলসী দড়ি মিলিয়া সকল।
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল।"

ঝঞ্ঝাবেগ শান্ত হ'য়ে এলো। নাম্‌লো স্তব্ধতা। মেঘাবরণ ছিন্ন ক'রে দেখা দিলো চাঁদের আলো।

"অকস্মাৎ রজত-জ্যোৎস্নায়
উজলি' উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।"

শ্মশানবক্ষে এ কার মূর্তি ?

রজত-ধুতুরা কর্ণে বিমল রজত বর্ণে
রজত-বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়।
রজত গিরির শিরে রজত জাহ্নবী-নীরে
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়।

* *

ধবল বৃষভ' পর বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ-মঙ্গল। [প্রেম ও ফুল : 'শ্মশানে নিশান']

'অর্ধদগ্ধ বংশখণ্ড ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড'—তারই মধ্যে শ্মশানেশ্বরের এমন মহান্ আবির্ভাব যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তৃতীয় নেত্রের অধিকারী, সন্দেহ নেই।

এ-সব কবিতা পড়বার সময়ে কতকগুলি কথা মনে পড়ে। আধুনিক কবিরা অনেকে নাকি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দূর সরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তা 'রেজল্যুশন' করে হয় না। 'যে পারে সে আপ্‌নি পারে।' গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমকালীন হয়েও কত স্ব-তন্ত্র। সত্যকার অনুভূতি নিয়ে নিজের মনের মতন ক'রে যিনি লিখবেন, তাঁরই লেখায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাবে। বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তার রূপ এবং রস। আপন আপন প্রণেতা অনুসারে কবিরা তার সন্ধান দেন।

রুক্ষতার মধ্যেও সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছেন ভবভূতি, ভীষণ ও বীভৎসের মধ্যেও রসের স্বাদ আছে বোদেলেয়রের কাব্যে। গোবিন্দচন্দ্র কোন্ স্তরের কবি, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। তাঁর ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য, সেইটিই বড় কথা।

৭

কোনো কবিরই সকল রচনা রসোত্তীর্ণ নয়, গোবিন্দচন্দ্রেরও নয়। অসামান্য ভালো কবিতার পাশে অনেক তুচ্ছ কবিতাও স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। তবে একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যাঁদের কাব্য শুধুই শিল্প-বিলাস গোবিন্দচন্দ্র তাঁদের দলে ন'ন। তাঁর জীবন থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবন ধরা দিয়েছে। প্রেমের উচ্ছলতা, তীব্র কামনা, মান অভিমান, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, দেশের প্রতি জ্বলন্ত প্রেম—হৃদয়ের প্রতিটি তরঙ্গ চিহ্ন রেখে গেছে তাঁর লেখায়। বাস্তব জীবনের দুঃখ-গ্লানির মধ্যে জ্বলেছে তাঁর অন্তরের ঊর্ধ্বগামী শিখা।

৮

প্রেমের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রেম কতটুকু দেহের কতটুকু আত্মার, সে বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি জানেন, ও দু'টিকে পৃথক্ করে দেখা যায় না।

"কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্রেম পদ্মফুল ?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।"

তাই তাঁর কথা :

"আমি তার ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।"

তবে সে প্রেম কি শুধুই দেহ-লালসা ? না,—কখনও নয়।

"আমি মহাকাম পতি
সরলা সে মহা-রতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ।**
ইহকালে পরকালে
জীবনের অন্তরালে
প্রীতির প্রসন্নমূর্তি জাগে অহরহ।"

অনন্ত সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর এ প্রেম এক অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে। এতে ক্লীবতা নেই, লোলতা নেই, পঙ্কিলতা নেই, আছে সরল নির্মল বলিষ্ঠ পৌরুষ। দেহ-মিলনের বিপুল আনন্দকেও কবি এমন সহজ অকুণ্ঠ আবেগভরে বর্ণনা করে গেছেন যে স্থূল অশ্লীলতা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে হয়তো মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমাদের মনে পড়তে পারে।

অশ্লীলতা যে বিষয়ের উপরে নির্ভর করে না, করে দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীর উপর, তার প্রমাণ সাহিত্যে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও লিখেছেন 'বিবসনা', 'বিজয়িনী'। তাতে কোথাও অশুচি মনের ছায়া পড়েনি। গোবিন্দচন্দ্রের 'উলঙ্গ রমণী'-ও একটি আশ্চর্য কবিতা।

"বড় ভালোবাসি তোরে উলঙ্গ রমণী,
অতি জ্যোতির্ময় দীপ্ত দেব-দেহখানি।" [কস্তুরী : 'উলঙ্গ রমণী']

তিনি স্মরণ করেছেন "কালিন্দীর কালো জলে" কৃষ্ণে-সমর্পিত-প্রাণ গোপিনীদের, "অসুর-শোণিত-নদে" নৃত্যপরা শ্যামাকে, এবং সব-শেষে শ্মশান-শায়িতা সর্ব-আবরণমুক্ত তাঁর প্রাণের 'সারদা'কে।

"নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখক্লেশ
নির্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি।"

'চিলাই'-য়ের তীরে সে দেহ ভস্মীভূত হয়েছে, কিন্তু কবির প্রাণে তার অগ্নিশিখা আজও অনির্বাণ।

যে সারদার অঙ্গে অঙ্গে তিনি একদিন অনঙ্গের পুষ্পশোভা দেখেছেন, আজ দৃষ্টি-অন্তরালে গিয়েও সে তাঁর মন-প্রাণ অধিকার ক'রে আছে।

"পাঁচটি বছর আজ, আজো দেখি তারে,
অবিকৃত সেই মূর্তি, সেই রূপ-রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত-সাগরে
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি'।"
[ফুলরেণু : 'প্রেতযোনি']

স্বপ্নের মত সে এসেছিল, স্বপ্নের মতই চলে গেছে।

"তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি
প্রবল পদ্মার স্রোতে ভাসি দু'টি ফুল,
তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি
মুহূর্ত মিশিয়াছিনু—বিধাতার ভুল।"
[ফুলরেণু : 'তুমি আর আমি'।]

কৈশোর-প্রেমের একটি কৌতুক-মধুর চিত্র আছে—"এই এক নূতন খেলা"য়। মনে পড়তে পারে, পনেরো বছর বয়সে কবির বিবাহ হয়েছিল।

"আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা।"

বিব্রত বালিকার সলজ্জ তিরস্কার :

"না ভাই তুমি দুষ্টু বড়
একটি বলে আরটি কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে গেলা।"
[কস্তুরী : "এই এক নূতন খেলা।"]

৯

তাঁর প্রধান কাব্য সাতখানি : প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, বৈজয়ন্তী, মগের মুলুক। অপ্রধান তিনখানি : প্রসুন, শোক ও সান্ত্বনা, শোকোচ্ছ্বাস। তা ছাড়া তাঁর বহু কবিতা সাময়িক পত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে, গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি। এই সকল কাব্যের আর একটি আকর্ষণ আছে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে ভাওয়াল, জয়দেবপুর, ব্রাহ্মণগ্রাম, সেরপুর, মৈমনসিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর পূর্ববঙ্গের নানাস্থান ঘুরে আসছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যে, ঘরোয়া ছবিতে, সরল গ্রাম্য শব্দে একটি চমৎকার আঞ্চলিক পরিবেশ রচিত হয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) **বরষার বিল**—প্রকাণ্ড বিল, চারদিক জলে জলময়। কত রকমের পাখী উড়ে উড়ে এসে জলে পড়ছে, আবার উড়ে চলে যাচ্ছে। —তারই ছবি।

এখানে ওখানে সবে, মধুর মধুর রবে
সরালী, কালেম, পিপী কত নাচে গায় !
চপল ও কঙ্‌গাই ওদের তুলনা নাই
উড়িতেছে পড়িতেছে জোড়ায় জোড়ায়। [প্রেম ও ফুল]

(২) **এ-ও কি স্বপন ?**—পূর্ববঙ্গের আর একটি গ্রাম্যচিত্র।

দয়েল বসিয়া আছে
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে,
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ।
আমতলে ডাকে গাই,
নিকটে বাছুর নাই,
বুড়ী করে ড' ড' করি' বৎস-অন্বেষণ।
একাকী রূপসী বালা
কুটীর করিয়া আলা
'ওশোরা'য় মাছ কুটে সুন্দর কেমন !
বঁটির উপরে বসা,
বাতাসে আঁচল খসা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে হয় উদ্ঘাটন,
অর্ধ নিশি, অর্ধ দিবা
একত্রে সে দেশে কিবা,
একত্রে উদয় অস্ত—লাবণ্য নূতন। [কুঙ্কুম : 'এও কি স্বপন' ?]

'আম-মাখা', 'চুল-শুকানো', 'কাঁথা সেলাই' প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর চতুর্দশপদী কবিতায় নারীর কত পরিচিত মনোরম ভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনের কত সরস চিত্র অনতিব্যক্ত রঙে ও রেখায় অপরূপ মাধুর্যে ফুটে উঠেছে।

১০

আজ আমরা অনেক সময়ে চতুর কবিদের আবেগহীন উত্তাপহীন, কখনও বা অর্থহীন হেঁয়ালি রচনার কৌশলের তারিফ্ করি। যে-কবিতা প্রাণের বন্যার দুর্বার বেগে আপন পথ কেটে চলে, তার সৌন্দর্য অনুভবের ক্ষমতাও বুঝিবা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছি। তবু খাঁটি ও ভেজালের, আসল ও নকলের পার্থক্য রসজ্ঞের কাছে ধরা পড়বেই। কাজেই গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার উপযুক্ত সমাদরের কোনদিন অভাব হ'বে না।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত)

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যক্ষেত্র প্রাক্-রবীন্দ্র কাব্যক্ষেত্র থেকে বহু দূরবর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ একথাও ঠিক যে আধুনিক বাংলা কাব্য স্বয়ম্ভূ নয়, অমূলতরু নয়। পূর্বেকার কাব্যঐতিহ্য মেনে নিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হয়। রবীন্দ্রকল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্রমননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও সর্বগামিত্ব, রবীন্দ্রশিল্পের অনবদ্য চারুতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরী একালের কাব্যসাধনার অবশ্য স্বীকার্য প্রেক্ষাপট। কিন্তু রবীন্দ্রসরণি বাংলা গীতিকাব্যের একমাত্র পথ ছিল না। গত শতকে আর বর্তমান শতকের সব গীতিকবিই রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণেই কাব্যসাধনার সার্থকতা মেনেছিলেন এমন নয়। গত শতকে গোবিন্দচন্দ্র দাস আর বর্তমান শতকে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রসরণি পরিত্যাগ করে অন্য পথে যেতে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস অন্য পথের কবি। তিনি নাগরিক কবি নন, রবীন্দ্রশিল্পলোকের কবি নন, রোমান্টিক সৌন্দর্যের কবি নন। তিনি গ্রামের কবি, স্বভাবের কবি, অসংযত প্রসাধনহীন ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কবি।

কঠোর দারিদ্র্য, যন্ত্রণাকর ব্যাধি, শোকের আঘাত, জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন, জমিদারের শত্রুতা, প্রাণহানির আশংকা: এসবেই তাঁর জীবন পূর্ণ ছিল। সে কারণে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে কাব্যসাধনা করা সম্ভব হয় নি। তিনি যা লিখেছেন তাতেই বাইরের জগতের এইসব ঘটনার ছায়া পড়েছে। গোবিন্দদাস কেবল প্রেমের কবি নন, তাৎক্ষণিক উপলব্ধিরত কবি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি বিষয় তাঁর কবিতার প্রধান আশ্রয়। বাল্যপ্রেম, পত্নীপ্রেম, জন্মভূমিপ্রেম তাঁর কবিসত্তাকে বারবার আলোড়িত করেছে। 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), কস্তুরী (১৮৯৬) কাব্যের কবিতাগুচ্ছে প্রতিফলিত হয়েছে কবিচিত্তের অসংযত সারল্য, দুর্মর হৃদয়াবেগ, নারীর প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ।

গত শতকের বাঙালি কবিদের প্রেমকবিতায় অল্পাধিক পরিমাণে ইংরেজী প্রেমকবিতার প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক ইংরেজি প্রভাবমুক্ত বাংলা কাব্যে ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর প্রেমকবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপস্থিত। সেই জন্য রূপকর্মের প্রতি অমনোযোগ, শব্দায়নে শৈথিল্য। আবেগের অসংযত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা অনায়াসলক্ষণীয়। তথাপি ইন্দ্রিয় ও আবেগের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের স্বাভাবিক অধিকার ছিল, যার ফলে তিনি সফল ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা রচনা করতে পেরেছিলেন।

আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মানবিক আবেগ আর বলিষ্ঠ দেহানুগত্য গোবিন্দদাসের প্রেমকবিতার দুটি প্রধান লক্ষণ। দেহ মনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশে সংকোচহীন কবি বলতে পেরেছিলেন :

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহছাড়া প্রেমকথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। দেহাশ্রয়ী হয়েও এইসব কবিতা দেহসর্বস্ব নয়; তার প্রমাণ :

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
আজো তার ভস্ম ছাই, বুকে মেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দ উল্লাসে তুলি আজো তার চুলগুলি
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।

এইভাবে কবি দেহকে আশ্রয় করেই এক নবরসের চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮) আর 'কুঙ্কুম' (১৮৯২) কাব্যের প্রেমকবিতায় যে অনবধানতা ও অপরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তা পরবর্তী 'কস্তুরী' (১৮৯৬) ও 'চন্দন' (১৮৯৬) কাব্যে নেই। 'রমণীর মন' (প্রেম ও ফুল) কবিতায় কবি নারীমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী :

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে-ইন্দ্রধনু ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ আবরণ,
কি যে সে মোহিনী মন্ত্র রহেছে গোপন !
কি যে সে অক্ষর দুটি নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন ?

বাল্যসখীর প্রতি কবির মোহ কয়েকটি কবিতার উৎস। 'পরনারী' (কুঙ্কুম) কবিতায় এই বাল্যপ্রেমের পরবর্তী মূল্যায়নে প্রকাশিত হয়েছে কবিহৃদয়ের অন্তর্জ্বালা আর অসহায়তা :

আজ, সে যে পরনারী !
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,
সে নবলাবণ্য আভা—সুষমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখায় তাহারি হাসি
হৃদয়সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি ?
সে যে পরনারী……
সে যে পরনারী !

তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,
ছুঁয়ো না লতিকা কেহ, আমার এ'পাপ-দেহ
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি !
সে যে পরনারী !

অপরপক্ষে, 'সারদা ও প্রেমদা' (কস্তুরী) কবিতাটি পবিত্র পত্নী-প্রেমের উপর স্থাপিত। প্রথমা স্ত্রী গত হলে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা সারদা ও দ্বিতীয়া প্রেমদার আকর্ষণ-বিকর্ষণে কবিচিত্তের যে দ্বন্দ্ব তা এখানে নিপুণভাবে রূপায়িত :

সারদা পশ্চিমে ডুবে প্রেমদা উঠিছে পূবে
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া
অপূর্ব সুন্দরী উষা অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া !

কিন্তু কবি দুই পত্নীর এই দ্বন্দ্বে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নি :

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দুজনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড়, পড়েছি ফাঁপরে
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?

এই সব কবিতায় উপলক্ষ্যের ছাপ রয়ে গেছে, তা উত্তীর্ণ হবার শিল্পসামর্থ্য কবির ছিল না।

চন্দন আর কস্তুরী কাব্যের অন্যান্য প্রেমকবিতায় পুরুষচিত্তের উপব নারীর প্রবল অধিকার কবি কখনো পূর্ণ আত্মনিবেদন, কখনো বা প্রবল অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতির বিচিত্র টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে কবি ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমেরই জয় ঘোষণা করেছেন। 'দিনান্তে' (কস্তুরী) কবিতায় কবির ব্যাকুল প্রার্থনা :

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণমন !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তরবার
পারি না যে না বলিয়া কেটে যায় মন !
প্রাণের লুকানো কথা—'একটি চুম্বন' !

অন্যদিকে 'শত্রু' (চন্দন) কবিতায় নারীর প্রতি কবির অভিযোগ ও প্রবল অস্বীকৃতি ঘোষণা :

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার।
নারী করে গুপ্তহত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে।
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল,
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি।

বাহ্যত অস্বীকৃতি ও বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে নারীপ্রেমের কাছে আত্মনিবেদনের এই বিশেষ ভঙ্গিমা গোবিন্দচন্দ্র দাসের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

গোবিন্দদাস ছিলেন প্রবল অভিমানী কবি। সংসারের হাতে তাঁকে এতো অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল যে অভিমানে তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছিল। কবির সে অভিমান কাব্যসাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৮৮৮তে রচিত 'কোথায় যাই' কবিতায় (প্রেম ও ফুল) তা ব্যক্ত হয়েছে :

আর ত পারি না আমি নিতে!
করুণার মমতার, এ বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ
আর না কুলায় শকতিতে!
হৃদয় গিয়েছে ভরে নয়ন উছলে পড়ে
ধরে না ধরে না অঞ্জলিতে,
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে।

কবি-জীবনে প্রিয়া-বিচ্ছেদে যে শূন্যতা তা নূতন করে করুণা মমতায় ভরে উঠলেও কবি-হৃদয়ের আর্ত ক্রন্দন থামে নি :

আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে!
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারে না বুঝিতে।

কবির এই প্রবল অভিমান তাঁর জীবন-সায়াহ্নে ১৯১১ সালে নূতন করে ব্যক্ত হয়েছে 'আমার চিতায় দিবে মঠ' কবিতায়—

ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ আমাদের কাছে দূরতর দ্বীপ; তবু সেই প্রবল অভিমানী কবির প্রতি থাকুক আমাদের শ্রদ্ধা আর সমবেদনা॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ কবির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত)

পরিষৎ সংবাদ

১৩৮০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় বঙ্গের তিনজন মনীষী ও কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠা যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সমারোহ সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি অতুলপ্রসাদ সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, কবি-নাট্যকার-কথাশিল্পী 'বনফুল' ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র অতুলপ্রসাদ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র সঙ্গীত সহযোগে তাঁহার বক্তৃতায় অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের প্রথম যুগে চিত্রপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ অতুলপ্রসাদের চিত্রখানি পরিষদ্‌মন্দিরে উপহার দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা অতুলপ্রসাদের অনেকগুলি গান পরিবেশন করেন। সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমার অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ মনোহর স্মৃতিচারণ করেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ পরিষদ্ মন্দিরে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের যে সকল ফোটোগ্রাফ শ্রীমদনমোহন কুমার সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির মধ্য হইতে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একখানি ফোটোগ্রাফ হইতে তাঁহার একখানি বড় ছবি প্রস্তুত করাইয়া পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়-অঙ্কিত অগ্রজ বসন্তরঞ্জনের একখানি পুরাতন তৈলচিত্র শ্রীমদনমোহন কুমার অনুষ্ঠানের পূর্বে সংগ্রহ করিয়া আনায় ঐ তৈলচিত্রখানি বসন্তরঞ্জনের অন্যান্য ফোটোগ্রাফের সহিত সভায় প্রদর্শিত হয়। বসন্তরঞ্জনের বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি, তাঁহার স্বহস্তলিখিত কড়চা, তাঁহার বহু চিঠিপত্র, তাঁহার স্বহস্তে সংশোধিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র প্রথম চারটি সংস্করণের পাঠের ও টীকাটিপ্পনীর 'স্লিপ', তাঁহার সংগৃহীত বহু প্রাচীন পুথি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি—তাঁহার চশমা, দোয়াত কলম, বুকস্ট্যাণ্ড, কাগজকাটা ছুরি, জলপানের ঘটি, পান ছেঁচিবার হামানদিস্তা, তাঁহাকে প্রদত্ত মানপত্র ইত্যাদি, বালক বসন্তরঞ্জনের শিক্ষা সম্বন্ধে বসন্তরঞ্জনের পিতা ও পিতৃব্যের লিখিত কয়েকখানি পত্র, বসন্তরঞ্জনের স্ত্রীর পত্র ও স্ত্রীকে লিখিত বসন্তরঞ্জনের পত্র, তাঁহার এনট্রান্স পরীক্ষার এডমিট কার্ড, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তাঁহার ভর্তি ও মাহিনার রসিদ ইত্যাদি যেগুলি শ্রীমদনমোহন কুমার তাঁহার জীবনীরচনার উপকরণ সংগ্রহকালে বিভিন্ন স্থান হইতে আহরণ করিয়াছেন সেগুলি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীতে সকলের কৌতূহল সৃষ্টি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন সভায় বসন্তরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বসন্তরঞ্জনের জীবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় সেগুলির বিবরণ দেন।

এই উপলক্ষে পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু অজ্ঞাতপূর্ব নূতন তথ্য-সম্বলিত, শ্রীমদনমোহন কুমার-সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নবম সংস্করণ প্রকাশ করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়।

এই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ রায় ও শ্রীসমিতাভ রায় পরিষদে দান করেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ আর একটি সভায় ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার পুত্র রণজিৎপ্রসাদ চন্দ এই চিত্রখানি পরিষদে উপহার দেন। এই উপলক্ষে রমাপ্রসাদের চিঠিপত্র, তাঁহার বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ' ও 'পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত' বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং রমাপ্রসাদের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। আচার্য্য সুনীতিকুমার 'রমাপ্রসাদ চন্দ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার অসুস্থ হইয়া পড়ায় সভায় যোগদান করিতে না পারায় 'ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ' নামক একটি নিবন্ধ রচনা করিয়া প্রেরণ করেন। সব কয়টি নিবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৮০ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার ডায়েরি, তাঁহার রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থাবলী ও তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাদির সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনী রাজেন্দ্রলালের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। এই সমস্ত দ্রব্যাদি পরিষদে কিভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহধর্মিণী রাণী ভুবনমোহিনী পরিষদে এই সমস্ত দুর্লভ চিরস্মরণীয় দ্রব্যাদি দান করিয়া পরিষদকে কিভাবে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি ও বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মের উদ্যোগে ৫ই মাঘ ১৩৮০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে রাজেন্দ্রলালের স্মরণসভায় অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন "ভাষা ও সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দান" বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি শ্রীবি. মিত্র, শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র ও শ্রীমদনমোহন কুমার ভাষণ দেন। সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও মনীষা সম্বন্ধে সভাপতির ভাষণে আলোচনা করেন।

৫ই ফাল্গুন ১৩৮০ পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতি-তর্পণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ—সর্বশ্রী পরিমল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী,

মহাদেব দত্ত, মৃণালকুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্ত বসু, সমরেন্দ্র নাথ ঘোষাল—বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ ও মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ বিজ্ঞানাচার্য্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করেন। সাহিত্য পরিষদের সহিত বিজ্ঞানাচার্য্যের সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ও অনুরাগের কথা নিবেদন করিয়া পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, পরিষদের বিজ্ঞান শাখার পূর্বতন সভাপতি, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানসাধনার অগ্রদূত সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-অঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমার তাঁহার ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন, শিক্ষকজীবন, গবেষকজীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অগ্নিযুগের স্বাধীনতা-সৈনিকদের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের যোগ এবং তাঁহাদের উভয়ের অন্তরঙ্গ প্রীতিসম্পর্ক বর্ণনা করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়।

১২ই চৈত্র ১৩৮০ বনফুলের সভাপতিত্বে পরিষৎ মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জর্মানীর কন্সাল্ জেনারেল মাননীয় হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সের ২৩০ খানি দুর্লভ প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্ম পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের হাতে অর্পণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ২৩০ খানি দুর্লভ মূল্যবান্ পুরাতন পুথি কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার ও ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য এই মাইক্রোফিল্মগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য করা সম্ভব না হওয়ায় দ্য ডাচ্ এসোসিয়েসন অফ পিওর রিসার্চ The Dutch Association Of Pure Research (ZWO), দ্য জর্মান (ওয়েস্ট) এসোসিয়েশন অফ পিওর রিসার্চ (Deutsche Forschungsgemein-schaft) এবং নেদারল্যাণ্ডের উত্রেখ্‌ৎ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Utrecht, Netherlands) এই মাইক্রোফিল্ম করার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন। নেদারল্যাণ্ডের উত্রেখ্‌ৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিট্যুট্ অফ্ ইস্টার্ণ স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর পি. গ্যাফ্‌কে (Dr. P. Gaeffke, Associate Professor, Institute of Eastern Studies, University of Utrecht, Netherlands) এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপাধ্যায় ডক্টর জি. চেম্‌পরথি (Dr. G. Chemparathi) এই সব দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত করায় পরিষদ্ হল্যাণ্ড ও জর্মানীর সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অধ্যাপক গ্যাফ্‌কের নিকট চিরঋণী। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীমদনমোহন কুমার এই সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ সভায় বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের সকলের নিকট অপরিশোধ্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। 'বনফুল' সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবিদ্যার প্রতি জর্মানীর অনুরাগ এবং ভারত ও জর্মানীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের ও ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া কন্সাল জেনারেলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। কন্‌সাল্ জেনারেল ডক্টর লিন্‌সের একটি সুন্দর ভাষণে ভারতবর্ষ ও জর্মানীর মধ্যে অতীতকাল হইতে

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস ও পারস্পরিক সহযোগিতা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত সুপ্রাচীন সারস্বত মন্দিরে আসিয়া তিনি আজ আনন্দিত। পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে কন্সাল্ জেনারেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে কন্সাল্ জেনারেল পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালা পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার নিদর্শন, বাঙ্গালার মনীষীদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি আগ্রহসহকারে দেখেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফারসী ও তিব্বতী পুথি কিভাবে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া তিনি সম্পাদকের নিকট হইতে একখানি পুরাতন বাঙ্গালা পুথি চাহিয়া লইয়া উহার কিয়দংশ পাঠ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দুস্তানী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সভাস্থল ত্যাগের পূর্বে তিনি পরিষৎ সম্পাদকের নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল পুথিখানি দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। পরিষদে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুথি, তাহার আলোকচিত্র, বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণ এবং আচার্য্য সুনীতিকুমারের ভূমিকা-সম্বলিত শ্রীমদনমোহন কুমার-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের গ্রন্থ দেখিয়া কন্সাল্ জেনারেল বিশেষ আনন্দ প্রদর্শন করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়।

২৯শে চৈত্র ১৩৮০ পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও হেমলতা ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরিত 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী' প্রবন্ধটি হিরণ্ময়বাবুর অসুস্থতার জন্য শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় পাঠ করেন। শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী "ইন্দিরা দেবী স্মরণে" প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ভাষণ দেন।

৩০শে চৈত্র ১৩৮০ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ্মন্দিরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বনফুল "মানুষ মধুসূদন" প্রবন্ধ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "কবি মধুসূদন" প্রবন্ধ এবং শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ "মধুসূদনের সাহিত্যচিন্তা" প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষৎমন্দিরে সংগৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত মধুসূদনের দুইখানি প্রাচীন চিত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেন। তন্মধ্যে একখানি তৈলচিত্র আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত অর্থে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐ তৈলচিত্রখানি শিল্পী শশিভূষণ পাল-কর্তৃক অঙ্কিত। এই চিত্রখানি ব্যারিস্টারের পোষাকে মধুসূদনের একমাত্র চিত্র। কলিকাতা হাইকোর্টে মধুসূদনের কোনও চিত্র এতদিন ছিল না, বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসার পর কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করিবার অনুমতি দিতে মহামান্য

বিচারপতিরা অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ("the general bad reputation of Mr. Datta" ছিল অন্যতম কারণ)। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সহায়তায় এবং বিদ্যাসাগর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকা নাথ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রশংসাপত্র (Character Certificate) দাখিল করিয়া মধুসূদন কিভাবে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে জয়ী হইয়া ব্যারিস্টারের পোষাকে হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। শ্রীমদনমোহন কুমার তাহার বিবরণ দেন। সম্প্রতি মধুসূদনের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উৎসব কলিকাতা হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইলে এবং বার এসোসিএসনের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বাজপেয়ী পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত হাইকোর্টে মধুসূদনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ করিলে পরিষৎ-সম্পাদক সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মধুসূদনের ব্যারিস্টারবেশের একমাত্র চিত্রখানির প্রতিকৃতি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে কলিকাতা হাইকোর্টে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে, পরিষদে রক্ষিত ব্যারিস্টারের পোষাকে মধুসূদনের পুরাতন তৈলচিত্র হইতে একখানি নূতন তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'বনফুল' ও শ্রীমদনমোহন কুমার ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেন; 'বনফুল' মধুসূদন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীমদনমোহন কুমার হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠিত তৈলচিত্রখানির আনুপূর্বিক ইতিহাস ঐ অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেন। এই নূতন তৈলচিত্রখানি প্রস্তুতে সহায়তার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিরস্মরণীয় সভাপতি পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র দত্তের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার "রমেশচন্দ্র দত্ত স্মারক ডাক টিকিট" প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ১০ই আশ্বিন ১৩৮০ (২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) সকাল ৯টায় পোস্টমাস্টার-জেনারেল কলিকাতা জি. পি. ও. প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করেন। আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার ভাষণে রমেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং ভারতবিদ্যা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তির কথা আলোচনা করেন। পোস্টমাস্টার-জেনারেলের আহ্বানে পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি এবং বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্—সৃষ্টি, সংগঠন ও উন্নয়নে রমেশচন্দ্রের দান এবং তাহার স্বদেশিকতা ও স্বদেশসেবার কথা আলোচনা করেন। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের মহানির্দেশকের (Director-General of Posts & Telegraphs,

India-র) পক্ষ হইতে আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারকে ও শ্রীমদনমোহন কুমারকে সুদৃশ্য গ্রন্থ 'রমেশচন্দ্র দত্ত স্মারক টিকিট সংগ্রহ' ('Romesh Chunder Dutt Commemoration Stamp') ও 'প্রসিদ্ধ ব্যক্তি টিকিটমালা' ('Personalities Stamp Series') উপহার দেওয়া হয়। স্মারক টিকিটে মুদ্রিত রমেশচন্দ্রের চিত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রমেশ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্রের অনুরূপ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৮০ বঙ্গাব্দের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও অনিবার্য্য বিলম্বের জন্য কার্য্যনির্বাহক সমিতি বিশেষ দুঃখিত। কাগজের দুর্ভিক্ষ ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও মুদ্রণ-সঙ্কট এবং প্রকাশনার বহুগুণ ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশের ন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত বার্ষিক অনুদানের স্থিতাবস্থা ও বারংবার আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তাবৃদ্ধি বিষয়ে ঔদাসীন্য—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশনকে অকল্পনীয় অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশনার জন্য আমরা ১৩৭৯ সালে মাত্র ৩৭৫ তিনশত পঁচাত্তর টাকা অনুদান পাইয়াছিলাম। ১৩৮০ ও ১৩৮১ বঙ্গাব্দের পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অনুদান এখনও পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। বহু মূল্যবান্, গবেষণামূলক, দীর্ঘ রচনা কাগজের অভাবে এবং প্রকাশনার ব্যয়বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টরবর্গের আনুকূল্যে ও সহায়তায় আমরা কিছু কাগজ সংগ্রহ করিতে পারায় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারিলাম। ১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যাও আমরা অচিরকাল মধ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের জন্য পরিষৎ সদস্য, অনুগ্রাহক, বঙ্গভাষাপ্রেমী ব্যক্তিগণের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করি॥

প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মুদ্রক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০ আচার্য্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪।